তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-সঞ্চয়ন

মিত্রালয়

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা-১১ হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচী

ভূমিকা

কয়েক বৎসর আগে বাংলা দেশে গল্প লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন প্রকাশের একটি রেওয়াজ প্রচলন হয়। প্রায় প্রতিটি লেখকেরই বারো থেকে পনের ষোলটি গল্প নিয়ে সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ এই নয় যে বারো থেকে ষোলটি গল্পই লেখকের সমান কদরের শ্রেষ্ঠ গল্প বা ষোলটি গল্পের বেশী কোন লেখকই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের মানের আর গল্প লেখেন নি। এ ক্ষেত্রে দাম ও কলেবরের দিকে দৃষ্টি রেখেই সংকলনকারীকে তাঁর সংকলন কার্য্য শেষ করতে হয়েছে। একটু চোখ মেলে দেখলেই এ তথ্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। সংকলনগুলির দাম চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত। যাঁর যেমন গল্পের কলেবর—তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পে তেমনি সংখ্যক গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। যাঁর গল্প আয়তনে ছোট—তাঁর গল্পর সংখ্যা বেশী, যাঁর গল্প বড় তাঁর গল্পের সংখ্যা কম হয়েছে। এই কারণে সাহিত্য-রসিক ও পাঠকদের বহু প্রশ্ন এবং তাগিদের সম্মুখীন হয়েছি। তাঁরা চিঠি লিখেছেন—মুখে প্রশ্ন করেছেন—শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে এই-এই গল্পটি বাদ গেল কেন? ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প। এই সংকলনের ভূমিকায় লিখে-ছিলাম—গল্পগুলি বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই কারণেই আমার প্রিয় গল্প নাম দিয়ে প্রকাশিত হল। প্রিয় বলেই এ গুলির যেমন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নেই তেমনি প্রিয় বলেই অক্ষম সন্তানের মত গল্পগুলি নিকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এদের নেই তাও নয়। প্রিয় গল্প নির্ব্বাচনের সময় লেখক গল্পের মানের দিকে দাবী না-রেখে পারেন না। পাঠক সমাজের কাছে এটি হল লেখকের পবিত্র দায়িত্ব এবং লেখকের মর্য্যাদা এই পবিত্রতার উপরেই নির্ভর করে। এর পর প্রকাশিত হয়েছে তারাশঙ্করের স্বনির্ব্বাচিত গল্প।

আমার সাহিত্য-কৃত্যে ছোট গল্পের সংখ্যা একশোর বেশী। বোধ হয় একশো কুড়ি পঁচিশ হবে। বিভিন্ন নামে (শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রিয় গল্প, স্বনির্ব্বাচিত গল্প বাদে ষোল-খানি গল্পের বইয়ে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এখন ওই তিনখানি গল্প সংকলন প্রকাশিত হওয়ার ফলে অনেক গল্প দুখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ায় দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমার দুখানি গল্পের বইয়ের সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। একখানি ছলনাময়ী অপরখানি বেদেনী। দুখানি বই থেকে কয়েকটা গল্পই ওই তিনখানি সংকলনে স্থান পেয়েছে। বেদেনী, ডাইনী, পিতাপুত্র, শ্মশানঘাট, ইত্যাদি। এখন দুটী পথ। প্রথম হল—গল্পগুলি দু দফা প্রকাশিত হতে দেওয়া, দ্বিতীয় হল—ওই গল্পগুলি বাদ দিয়ে বাকীগুলি নিয়ে বই দুখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা। তাতে কলেবর শীর্ণ হবে—তা হোক ; কলেবরের শীর্ণতা নিয়ে আমার মনের খুঁতখুঁতুনি নেই ; আমি নিজেই অতি শীর্ণকায় মানুষ, শীর্ণতা হেতু গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি থাকলে আমার দেহধারণ করাও চলে না। মনের খুঁতখুঁতুনি অন্যত্র। আজকাল বাঙলা বইয়ের মলাট বাঁধাই অর্থাৎ দর্শন-সৌষ্ঠব একটি বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। নির্ভয়ে বলা চলে যে বিয়ের বাসরে মেয়েদের সাজসজ্জার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। অনেকে বলেন—ওই বিয়ের বাসরে উপহারের টেবিল আলো করে বসবার জন্যই বইয়ের এই সাজসজ্জার ঘটা ; টেক্সট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত বইয়ের তালিকার মত বিয়ের উপহার তালিকাভুক্ত হতে গেলে রঙ-চঙ সাজসজ্জা একেবারে অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রনাথের সাদা মলাটে শুধু নাম লেখা কাব্যগ্রন্থ প্রবেশ করে নিরাভরণা সম্রাজ্ঞীর মত বা বল্কল-পরিহিতা কণ্বদুহিতার মত। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ প্রবেশ করে লাল-পেড়ে শাড়ী-পরা সমাজপতি গৃহিণীর মত, বেনারসীপরা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা বধূকন্যারা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু অন্য সকলের সে দাবী কোথায় ? আমার দুইপুরুষ নাটকে পল্লীসমাজের যজ্ঞি বাড়ীতে মেয়ে খাওয়ানোর একটি প্রসঙ্গ আছে। গরীব নুটু মুখুজ্জের স্ত্রী বিমলার শাঁখা ছাড়া ভূষণ নেই, খদ্দরের শাড়ী ছাড়া বসন নেই। তাই পরেই সে জমিদার বাড়ীতে

খেতে গিয়ে উপর তলায় সম্ভ্রান্ত ঘরের অর্থাৎ গয়না[illegible] পরা মেয়েদের সঙ্গে বসতে গিয়েছিল। জমিদার গৃহিণী মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলেন—'তুমি আবার এখানে কেন বাপু, তুমি নিচে গিয়ে বস।' বিমলা নিচে বসেও অপমান থেকে পরিত্রাণ পায় নি। ছেঁড়া পাতায় খেয়েছিল, মাছের সময়—সকলে যখন চারখানা মাছ পেয়েছিল—তখন সে পেয়েছিল দুখানা। এর পর সে একদিন ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করে ভাবী পুত্রবধূর গয়না কাপড় প'রে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। কথাটা আমার নিছক কল্পনা নয়। ঘটনাটি সত্য, অবশ্য একটুখানি ফলাও করেছি বই কি। এ সত্য মিথ্যা হবার নয় অন্তত বিয়ের ক্ষেত্রে; সে সিভিল ম্যারেজ হলেও; দম্পতি বামপন্থী হলেও। বনে .এবং সঙ্গিনীরা যদিচ সেখানে অলঙ্কার ও শাড়ী ঝলমল ক'রে যান না তবুও বই যা উপহার স্বরূপ ঢোকে তা ঝলমলে সজ্জায় সজ্জিত। বামপন্থী লেখকদের বইয়ের মলাটও সেই কারণে সনাতনীদের বইয়ের সঙ্গে সমান ঝলমলে। বিয়ে ছাড়াও অন্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণ বাজারেও সেই এক হাল। বই কিনতে আসেন যে ক্রেতারা তাঁদের প্রাথমিক বিচার মলাটের উপরেই নির্ভর করে। সেই হেতু এখন বইয়ের মলাটের খরচ এমন বেড়েছে যে মোট খরচার সিকিতেও কুলোয় না। বইয়ের আকার ছোট হলে খরচাটা অনুপাতে আরও বেড়ে যায়। বই তিরিশ ফর্মারই হোক আর আট ফর্মারই হোক এক পুট ছাড়া দুদিকের বোর্ড, ব্লক, ডিজাইনের খরচা সমান দাঁড়ায়। সেই কারণেই নেহাৎ শীর্ণকায় বই দুখানাকে মিলিয়ে একখানা করে ব্যয়বাহুল্য থেকে বাঁচাতে—বেদেনী ও ছলনাময়ী বই দুখানির অবশিষ্ট গল্প একত্রিত ক'রে গল্পসঞ্চয়ন প্রকাশিত হল। এবং শাঁখা ও লালপেড়ে শাড়ীর বদলে ঝলমলে বসনভূষণ পরেই নিমন্ত্রণ পাবার প্রত্যাশায় বসে রইল।

ছলনাময়ীর গল্পগুলি আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম কালের লেখা। ১৯৩৩।৩৪ সালের লেখা। বেদেনীর গুলি পরবর্তী কালের। বেদেনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। ১৯৩৯।৪০ সালের রচনা। তখন আমার অপরিসীম উৎসাহ।

কিছুদিন আগেই 'রসকলি' গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। রসকলি উৎসর্গ করেছিলাম মহাকবিকে। রসকলি পড়ে তিনি লিখেছিলেন—'তুমি একজন লিখিয়ে বটে।'

ছলনাময়ী আমার প্রথম গল্পসংগ্রহ। রাইকমল ছলনাময়ী পড়ে মহাকবি আমাকে ডেকেছিলেন। আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। আজ দুখানি বইকে এক ক'রে প্রকাশ করবার সময় সেই কথাগুলি আপনি এসে স্মৃতিকে নাড়া দিল। ইতি—

১৫।১২।৫৪.

টালাপার্ক, কলিকাতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয়-দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণ-যাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্য-হীন অচঞ্চল পল্লী-জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা কোন কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যা-ভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মত হইয়া উঠিল।

দলটা খুব বড় নয়, জন ত্রিশ বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকী সাতাশ আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে—ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহার উত্তরমুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড় পুকুর। বেলাও তখন দু-পহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা, বাজীকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাটো নানা টুকি-টাকির মত। বাকী সকলে পুকুরে মুখ-হাত ও হাঁটু পর্য্যন্ত পথের ধূলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছের ছায়াতলে খানকয়েক পুরানো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটি ছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়; শীর্ণ শরীর, তার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নূতন কিছু খুঁজিতেছিল। চোখে

চোখে ইসারাও চলিতেছে. ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে ছুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় বলিল, পশুপতি শুয়ে পড়লে যে! ওঠ, একবার তামুক খাও, খেয়ে ভারী দুজনকে নিয়ে একবার বাজারে যাও। জিনিসপত্র যা নাই তা কিনে নিয়ে এস। বলি রমণ, তোমার নাসিকা যে গর্জ্জন করছে মাঝে মাঝে! ওঠ, উঠে আলুগুলো কুটে ফেল!

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ান ঘোষ, ভীম বা যে কোন রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা—এবং রুক্ষতা আছে, একটা গাম্ভীর্য্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়।

পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল; ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—ওঠ, ওঠ! ওই দেখ মূলগায়েনের গাড়ী এসে গেল!

সত্যই মূলগায়েনের গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছিল; একখানা খোলা গাড়ীর উপর গোটাচারেক বড় বড় কাঠের সিন্দুক-জাতীয় বাক্স বোঝাই করিয়া সেই বাক্সের উপর ছাতা মাথায় দিয়া মূলগায়েন বসিয়া ছিল,—তাহার সঙ্গে দু'টি সুশ্রী ছেলে। মূলগায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানেও সে-ই অধিনায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে-ই হয় বৃন্দাদূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সে-ই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখী, কখনও রাণী—একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর মারাত্মক গানগুলির সে-ই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির বয়স যে কত সে বলা কঠিন, তবে ছোটখাট মানুষটি, বেশ সুশ্রী—সর্ব্ব অবয়বের মধ্যে একটি কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা, অপরটি কৃষ্ণ।

পশুপতি আর বিলম্ব করিল না, সে ভারবাহী দুইজনকে লইয়া গ্রামের বাজারের ঠিকানায় বাহির হইয়া গেল। মূলগায়েন গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রসন্নমুখে বলিল,

সংসার যে পেতে ফেলেছেন দেখছি ঘোষালমশায়! সাধে কি আর ব্রাহ্মণকে দেবতা বলেছে—প্রসন্ন দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই মা-লক্ষ্মীকে এসে ভাণ্ডার খুলে বসতে হবে।

ম্যানেজার ঘোষাল প্রসন্ন হইতে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে আদেশ করিল, ওরে রাধু, পাত, সতরঞ্চিটা পেতে ফেল, হাত পা ধোবার জল নিয়ে আয়। আর ঠাকুর—সরবৎ তৈরী কর দেখি।

মূলগায়েন বলিল,—আপনাদের জল খাওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ, সে পথেই নদীর ঘাটে সেরে নিয়েছে সব।

—তা বেশ! আমার সখী-সখাকেও জল খাইয়েছি পথে। বলিয়া সস্নেহে রাধা ও কৃষ্ণ—ছেলেদুটির দিকে চাহিল। তারপর একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিল,—সেও তো অনেকক্ষণ হ'ল ঘোষালমশায়! আমি বলি কি—সের খানেক বাতাসা—; ম্যানেজার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান মশায়। ওদিকে আবার সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগেছে। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিছু দূরেই সেই ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে বিবদমান ছেলে দুইটা কখন নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চীৎকার করিলে ম্যানেজার বা দলের লোক জানিতে পারিবে, যুদ্ধে বাধা দিবে—তাই তাহাদের এ নিঃশব্দ যুদ্ধ।

ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইতেই ছেলে দুইটা পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া অতৃপ্ত ক্রোধভরে বন্য-পশুর মত শুধু শ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিতে আরম্ভ করিল। একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ছেলে দুইটার পিঠে সপাসপ ঘা-কতক করিয়া দিয়া ম্যানেজার ছেলে দুইটাকে দুইটি পৃথক স্থানে বসাইয়া দিল। মূলগায়েন বলিল, হরিদাসকে বাজারে পাঠালাম ঘোষালমশায়; নিয়ে আসুক এক সের বাতাসা। দু-খানা ক'রে মুখে দিয়ে একটু জল খাবে সব।

ম্যানেজার বলিল—দেখুন, এতে রেওয়াজ খারাপ হয়। আজ দিলেই কাল বলবে আমাদের বাতাসা দেওয়া হোক। আপনার কাছে তো কেউ যাবে না,

জ্বালাবে সব আমাকে! এই দেখ—আজ বাতাসা মূলগায়েন নিজে হ'তে দিলেন। তা ব'লে—রোজকার রোজের কোন সঙ্গ নাই এর সঙ্গে।

সেই ছেলে দুইটা ফুলিয়া ফুলিয়া তখনও কাঁদিতেছিল, ম্যানেজার অকস্মাৎ তাহার বড় বড় দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কট্ কট্ শব্দ করিতে করিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—কদ-লী বন দল-নের জন্য, মদ-মত্ত হস্তীকে আর বারংবার অঙ্কুশা-ঘাতে জাগ-রিত করতে হবে না। চোপ—বলছি চোপ! কাঁদবি ত' ছেলেকে ওই ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ ক'রে খেয়ে নেব আজ! তাহার রক্তবর্ণ চোখের তারা দুইটা বন-বন করিয়া চরকীর মত ঘুরিতেছিল।

ছেলেগুলি এবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মূলগায়েনও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—বেশ ভাল ক'রে একটা পান দাও তো সখি!

ম্যানেজার বলিল—রাধে, আমার জন্যেও একটা।

রাধার ভূমিকার ফুটফুটে ছেলেটি মূলগায়েনের পানের বাটা লইয়া কিশোরী মেয়ের মতই পান সাজিতে বসিল।

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলেগুলাও শান্তভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মূলগায়েন স্নান করিয়া তিলক কাটিয়া নির্জ্জনে জপ করিতে বসিল। ম্যানেজারের বিশ্রাম নাই, সে ঠায় রান্নার কাছে বসিয়া আছে।

—ওহে—জল দাও হে, জল—। ভাত পুড়ে যাবে, অ-ঠাকুর! বলিতে বলিতে সে নিজেই এক ঘটী জল ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল। জল দিয়া উনানের কাঠগুলি টানিয়া বাহির করিয়া আগুন কমাইয়া দিল; তারপর সে নিজে তেল লইয়া মাখিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরই তাহার হাঁকে-ডাকে নিদ্রাতুর দলটি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। চান ক'রে নে সব! এই এই—ওহে শশী—ও শ্যাম—ওঠ হে—ওঠ সব। তখন তাহার নিজের স্নান হইয়া গেছে, লম্বা চৈতনের গোছাটা দুইহাতে টানিয়া টানিয়া গ্রন্থি দিতে দিতে সকলকে ম্যানেজার ডাক দিতেছিল।

একজন প্রৌঢ় আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া গান ধরিয়া দিল—'ঘুমিয়েছিলাম বাবুর বাগানে'! লোকটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অপেক্ষাও তাহার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার!…স্বরের কৌশলে এবং ভঙ্গিতে খুব দূর হইতে ডাক শুনিয়া সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিতটা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একজন তেল বিতরণ করিতে বসিল—প্রত্যেকের বরাদ্দ একপলা। তাহার পর স্নান। স্নানান্তে সকলেই একখানা করিয়া আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া বসিল। প্রসাধন পর্ব্বটাই দীর্ঘ। নানা ছাঁদে টেরীকাটা শেষ করিয়া সব পাতা লইয়া বসিয়া গেল। সেই গায়ক প্রৌঢ়টি বাঁ-হাতে খানিকটা মাটি খাল করিয়া তাহার উপর পাতা পাড়িল। পাতাঢাকা খালটিতে তরল ডাল অধিক পরিমাণে ধরিবে!

আহারের পরই একজন গ্রামে গিয়াছিল। ইহারই মধ্যে কে যে কখন সন্ধান লইয়াছিল কে জানে, কিন্তু সঠিক সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল। লোকটি রায়েদের বাড়ীর ভুলু রায়ের কাছে আসিয়া উঠিল। ভুলু রায়ের বয়স বৎসর চব্বিশেক, বেকার জমিদার-তনয়, আয় বাৎসরিক শতখানেক টাকা। কিন্তু তবুও সে এরণ্ডহীন দেশের মহাপাদপ, কায়া এতটুকু হইলেও ছায়ার ভনিতাটা তাহার বিপুল, লোকে না মানিলেও সে মাতব্বর সাজিয়া বসিয়া আছে।

ভুলু প্রথমটা একেবারেই গা-ছাড়া দিয়া বলিল—ক্ষেপেছ! লোকের ঘরে চাল অভাবে হাঁড়ি চলে না, লোকে যাত্রা শুনতে পয়সা দেবে!

লোকটি বলিল—বেশ তো, একবার দেখুন—যদি নাই হয়, তো আর কি করা যাবে!

—তা-দেখ, তোমরা নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখ। এই লক্ষপতি বাঁড়ুজ্জেরা রয়েছেন, ওই গাঁয়ের শেষে রায় বাবু রয়েছেন। তারপর—ও পাড়ার তো সবাই বাবু; লম্বা কোঁচা—দেখ চেষ্টা ক'রে!

—দেখুন দেখি, রায়বাড়ীর নাম হ'ল বনেদী-বাড়ী! সে বাড়ীতে না হ'লে

আমরা চলেই যাব। আপনি চেষ্টা করলে কি না হয় বাবু! তবে আপনি না হ'লে হবে না!

ভুলু প্রসন্ন হইয়া বলিল—কি নেবে আগে শুনি। দক্ষিণে কত?

—সে যা' হয় দেবেন; আপনাদের কাছে কি আমাদের কিছু বলা সাজে?

ভুলু হিসাব করিয়া দেখিল, গোটা পনের টাকা বেশ উঠিবে, দুই এক টাকা বেশী ওঠাই সম্ভব। সেটাকে সে পকেট খরচ খাতে রাখিয়া দিয়া হিসাব করিল, আসরের খরচ—আলো, পান-তামাক ইত্যাদিতে গোটা তিনেক টাকা লাগিবে; সুতরাং বারো টাকা দিতে পারা যায়।

আরও দুই টাকা এদিক ওদিক বাদ দিয়া সে বলিল—এই দেখ, দশটি টাকা আর খোরাকী একমণ চাল—এই পাবে। পারো যদি তবে দল-বল নিয়ে চলে এসো; এই ন'টা নাগাদ গান জুড়তে হবে।

লোকটি হতাশ হইয়া বলিল—বাবু আমাদের দলের মাইনেটা দেন। বত্রিশ জন লোক—অন্তত ষোলটা টাকা দেন!

ভুলু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর একটি টাকা মেরে কেটে! তোমাদের আবার কালীয়-দমনের দল, ও আর কেউ শুনতেই চায় না। সখের দল হ'লে বরং লোকে দিত চাঁদা খুশি হয়ে!

লোকটি বলিল—তাইতো! একটু ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা এই দশ মিনিট পরেই আমি এসে খবর দিয়ে যাচ্ছি!

ভুলু রায় ত্বরিত-কর্ম্মা লোক—এবং বিজ্ঞতাও তাহার এই বয়সে যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে। ওই এগার টাকাই দলটির পক্ষে 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা' একথা সে বেশ জানে। সে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই সে আসিয়া উঠিল 'উরু' দাদার বাড়ী। 'উড়োনচণ্ডী' হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'উরু'তে পরিণত লোকটির পরিচয় নামেই বিদ্যমান; সে থিয়েটারে পার্ট করে, স্থাবর

অস্থাবর বেচিয়া কলিকাতায় যায়, বেশ গোলগাল চেহারা, মাথায় একটি টাক—সে বলে, ও আমার টাকার টাক নয়, ফাঁকার টাক—স্থখটাক নয়, দুখটাক।

—কি করছ উরুদা ?

—এই বসে বসে তামাক খাচ্ছি—আর তক্তা বাজাচ্ছি। বললাম তোদিগে—যে, একখানা বই ধরে রিহারশাল বসিয়ে দে—তা'—হুঁ ! পচে মর গে তোরা !

—সে হবে। এখন একটা যাত্রার দল এসেছে ; কি করি বল দেখি !

—যাত্রা ? তা' দে লাগিয়ে দে।

—কিন্তু ষোল টাকার কম যে কিছুতে ঘাড় পাতলে না। কাঁদাকাটা করছে। বলছে—দলের মাইনেটা পুষিয়ে দেন।

—বেশ, আমি একটাকা দোব। তুমি আর সব দেখ।

—তা হলে আসরের ভারটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে।

—তা সব ঠিক করে দোব। দাঁড়া আলো এখুনি দেখে আসি—কুমারীশ ময়রার আলোটা ঠিক করতে বলে আসি। ওর ডে লাইট্‌টা খুব ভাল। উরুদা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রওনা হইল। ভুলুও বাহির হইয়া যাইতেছিল—উরুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিল—শোন-শোন, ও ঠাকুরপো ! ভুলু ফিরিল, উরুর স্ত্রী বলিল—এই দেখ আমি ভাই আলাদা দোব চার আনা ; করাও যাত্রা। মেয়ে মহলে সবাই দেবে !

অতঃপর ভুলু গিয়া উঠিল শূলপাণির বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে বুঝিল তাহার আসা ভুল হইয়াছে। বাড়ীতে তখন তুমুল কলহ। বড় বৌয়ের পাঁচ-বৎসরের কন্যা সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধতোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু লইয়া কলহ। ভুলু ফিরিতেছিল, শূলপাণির ছোট ভাই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল—সে ভুলুকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—ফিরলে যে !

—এসেছিলাম—তা'—; একটু নীরব থাকিয়া সে বলিয়াই ফেলিল—একদল যাত্রা এসেছে। তাই, চাঁদা ক'রে—যদি হয় একরাত্রি তাই —তা—।

—তা বেশ তো, হোক না একরাত্রি—চাঁদা দোব আমরা। বেশ !

বড় বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'ঘরে ভাত নাই—বাইরে রোশনাই'—সেই বিত্তান্ত! লোকের তো সিন্দুকে টাকা ধরছে না, তাই চাঁদা করে যাত্রা করবে!

মেজ বৌ বলিল—আমি ভাই আট আনা দোব।

সেজবৌ বলিল—একটা টাকাই দাও দিদি! আমি তো আট আনা পাব!

—সে ভাই আজ হবে না। এই আট আনাই আমাকে ধার করতে হবে। সেজবৌ আজ মেজবৌয়ের প্রতি প্রসন্নই ছিল—সে বলিল—তা হ'লে আমিই এক টাকা দিই। তুমি আমাকে এক টাকাই দিয়ো। বড়বৌ ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভুলু, এই নাও ভাই। সবাই যখন দেবে—তখন আমরাই বা না দিলে হবে কেন? আমার ভাই এক টাকার দলে নাম নিকো খাতায়! আর ভাই সকালে আরম্ভ করিয়ো। হ্যাঁ!

ছোট ভাই বলিল—তবে আমারটাও নিয়ে যা।

ভুলু বলিল—একখানা সতরঞ্চি দিতে হবে কিন্তু আসরের জন্যে!

—বেশ, লোক পাঠিয়ে দিস।

কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলের দল বস্তা ঘাড়ে চাল আদায় করিতে আসিয়া বলিল—চাল দাও গো যাত্রার।

একদল মেয়ে আসিয়া বলিল—বড়বৌ, চল যেতে হবে তোমাকে।

আশ্চর্য্য হইয়া বড়বৌ বলিল,—কোথায়?

—পদ্মকাকী চাঁদা দেয়নি। কেন দেবে না? চল যেতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে বড়বৌ উঠিল, বলিয়া গেল,—মেজবৌ দেখিস তো ভাই, আমার ভাতটা না পুড়ে যায়! চল।

লোকটি নিবেদন করিল,—এগার টাকা আর একমণ চাল, এর ওপর আর কিছুতেই উঠল না।

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—দলের মাইনেই তো বারো টাকা! এক টাকা কি আমরা গাঁট থেকে দেব না কি?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার মধ্যে একখানি পূরবী রাগিণী ধরিবার জন্য বেহালাদার বাক্স হইতে বেহালাখানি বাহির করিয়া সুর বাঁধিতেছিল, সে বলিল—বসে থাকলে তো কেউ কিছু পাবে না। ব'সে থাকি, না, ব্যাগার খাটি, কিছু কমই না হয় নেবে সবাই। সিকি বাদ বার আনা ক'রে দেন, বার সিকি তিন টাকা বাদ দিয়ে ন'টাকা মাইনে—দুটো টাকা থাকবে।

ম্যানেজার বলিল—তা হলে তুমিই দেখ ওস্তাদ;—বলে কয়ে দেখ সব। আমি মূলগায়েনকে বলে দেখি। ঘুমালো নাকি মূলগায়েন?

মূলগায়েন ঘুমায় নাই—নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া ছিল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই গ্রামে সে বৎসর বৎসর যাত্রা করিতে আসিত। তাহার গুরু—অধিকারীর দলে সে তখন সাজিত রাধা। মনে পড়িয়া গিয়াছে!

ম্যানেজার আসিয়া ডাকিল—ঘুমালেন নাকি গো!

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া মূলগায়েন উত্তর দিল—বলুন।

—এরা যে এগার টাকার বেশী দিতে চায় না গো!

—তা হলে?

—সেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওস্তাদ বলছে যে বসে থাকার চেয়ে দলের লোকে মাইনেও কিছু কম নিক—আপনারও কিছু কম থাক। হয়ে যাক এতেই।

—বেশ। তাই হোক।

ম্যানেজার চলিয়া গেল। মূলগায়েন আবার চোখ মুদিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার মনোলোকে জাগিয়া উঠিল স্মৃতির ছবি।—

ছোট দশ বৎসরের কমনীয়কান্তি একটি ছেলে—দর্পণে দেখা সে রূপ এখনও তাহার মনে আছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে সে যে যাত্রার দলে আসিয়া

জুটিয়াছিল, সে জানিতেন পূর্ব্ব অধিকারী। অধিকারীর ঘরেই স্নেহ মমতার মধ্যেই সে বাস করিত। সন্ধ্যায় গান শিখিত—অধিকারী পাখির মত তাহাকে শিখাইতেন, বৃন্দা প্রশ্ন করিত—বলি—হ্যাঁগো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রাণী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো?

সে স্বর করিয়া ঝোঁক দিয়া উত্তর দিত—বৃন্দে গো! পিরীতির রীতি এমন কেন বলতে পার সখি?

—কেমন সে রীতি বল দেখি? আমি তো জানি না, বল তো শুনি?

—পিরীতি এত দুঃখময় কেন সখি?

—দুঃখময়? না-না-না তা কি হয়! পিরীতি তো সুখের সাগর গো!

—না, না সখি—পিরীতি বড় দুঃখময়! বলিয়া সে গান ধরিত—'পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া নাইতে নামিনু তায়।'

যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা আঁকিয়া বিচিত্র বেশ পরিয়া সে এমনি কথাগুলি বলিয়া যাইত। দেশ দেশান্তরের কত বিচিত্র আসর—সামিয়ানা—নাটমন্দির—কত আলো—কত জনসমাবেশ! এই গ্রামের বাঁড়ুয্যে বাবুদের প্রকাণ্ড নূতন নাট-মন্দিরের সে শোভা—অপরূপ শোভা! তখন তাহার বয়স বারো।

সাজঘরের দুয়ারে গ্রামের ছেলেদের কত উঁকি-ঝুঁকি; তাহার সহিত আলাপ করিতে তাহাদের কত ব্যগ্রতা! মধ্যে মধ্যে ওই ঘোষালের মত রক্তচক্ষু উগ্রদর্শন হরিশ ঘোষ তাহাদের তাড়া করিত—এই ধরতো ছেলেব পালকে! খাব! খাব! ছেলেরা ছুটিয়া পালাইত! আসরে বসিয়া তাহারা পান ছুড়িত। সে সেদিকে তাকাইলে দেখিত দাতাও কৃতার্থ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে ঘুমাইয়া ঘুম শেষ হয় নাই—সকালে বসিয়া সে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল। কানের মধ্যে তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতেছিল। বৃন্দা যেন ডাকিল—শ্রীমতি! রাধে! তাহার

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন নয়, একটি আট নয় বছরের মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে —শ্রীমতি—রাধে!

—ধেৎ ছেলে! ইয়ার্কী করতে এসেছ?—মেয়েটি ছুটিয়া কিছুদূর পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।—তোমাকে ডাকছে।

—ভাগ্! সে আবার চোখ বুজিল।

—শ্রীমতি! তোমাকে আমার মা ডাকছে গো!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মেয়েটি মিনতি করিয়া বলিল—আমার মা সন্দেশ তৈরী করেছে, তোমাকে ডাকছে। এস!

সন্দেশ! লুব্ধ ছেলেটি এবার না উঠিয়া পারিল না। দলের লোক জনকতক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে গিয়াছে, কতক তখনও অসাড় হইয়া নিদ্রামগ্ন; সে উঠিয়া মেয়েটির সঙ্গে চলিল। আঁকাবাঁকা পল্লীপথ—দুই চারিটি লোক, কেহ যায় কেহ আসে।

—ওই দেখ রে, ওই কাল রাধিকে সেজেছিল! নয় হে ছোকরা?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওই, ওযে আমাদের বাড়ী চললো!

—তোমাদের কেও হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বিপন্ন হইয়াও প্রতিবাদের সময় পাইল না। মেয়েটি এবার গতি দ্রুততর করিল—ত্বরিতগতিতে আরও কয়টা ছোট গলি ঘুরিয়া ঘন বৃক্ষপল্লবে বেষ্টিত ছোট একটি আঙিনায় আসিয়া উঠিল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে—উজ্জ্বল হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এস, এস—গোপাল এস তোমার জন্যে আমি বসে আছি।

মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর। গোপাল কেন হবে?—ও যে শ্রীমতী, রাধে।

মা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল—পাজী মেয়ে কোথাকার—দেখবি?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। মা ছেলেটিকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—মুখ হাত ধোয়া হয়নি তো তোমার, গোপাল? বলিয়া নিজেই একটু তামাকের গুলগুঁড়া, একটি তালপাতা, একঘটি জল নামাইয়া দিল। তারপর প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গোপাল, আমরা বোষ্টম; আমাদের ঘরে একটু জল খাবে তো?

ছেলেটি বলিল—আমিও বোষ্টম।

—বোষ্টম! মেয়েটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—তাই তো বলি, বোষ্টম না হলে কি এমন সুন্দর রাধা হয়। একেবারে সাক্ষাৎ রাধা। তা হ'লে একটু জল খাও—কেমন?

ঘরের তৈরী ক্ষীরের নাড়ু, বড় চমৎকার। কিন্তু আর চাহিতে তাহার লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল খাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

—হ্যাঁ বাবা, একটি গান শোনাবে?

—কি গাইব বলুন!

—ওই যে শ্যাম শুকপাখী—!

গুন্ গুন্ করিয়া ক্রমশ কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া সে গাহিল—শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি—ধরিলাম নয়ন-ফাঁদে!

একটা নয়, আরও একটা গান শুনাইয়া সে পান চিবাইতে চিবাইতে বাসায় ফিরিল।

সেই কয়জন অল্পবয়সী বাবু! তাহাদেরও আজ মনে পড়িতেছে! তাহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই ছোকরা, শোন তো!

—কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে? সে কেমন ভীত হইয়া পড়িল।

—তোমার নামটি কি?

—আমার নাম ?—আমার নাম গৌরদাস দাস।

—কোথায় বাড়ী তোমার ?

—আজ্ঞে, আমার মা বাপ কেউ নেই ; আমি অধিকারী মশায়ের বাড়ীতে থাকি।

—মাইনে-টাইনে দেয় ? না, পেট-ভাতাতেই থাক ?

সে চুপ করিয়া রহিল। একজন আবার বলিল—দেখ, আমাদের থিয়েটারের দল হয়েছে। আমাদের দলে যদি এস, তবে আমরা মাইনে দেব ; মা বাপ নাই বলছ—বাড়ী ঘর ক'রে দেব, বুঝেছ !

—আজ্ঞে না। সখের যাত্রা বা থিয়েটার তাহার ভাল লাগে না, সেখানে রাধাকে নাচিতে হয়। এমন করিয়া বৃন্দা সেখানে রাধাকে ভক্তি করে না।

—কেন ?

এবার সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর তাহাকে উত্যক্ত করিল না—হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। বাসায় আসিয়া দেখিল—সেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।

—শ্রীমতি !

এবার সে হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি বলিল,—মা ডাকছে।

সেই বৎসর হইতে বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর রাস-যাত্রায় তাহাদের দলের বায়না বাঁধা হইয়া গেল। বৎসরে বৎসরে সে দলের সঙ্গে আসিত। বিনা আহ্বানেই সে এখন সেই আখড়াতে গিয়া ডাকিত—মা !

—কে,—গোপাল—গৌরদাস ! এস বাবা, এস। এই তোমার জন্যেই খাবার করছি। গোপাল ক্ষীরের লাড়ু বড় ভালবাসে—না বাবা ?

সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কলকণ্ঠে মেয়ে বলিয়া উঠিল—নাড়ুগোপাল ! একবার হামাগুড়ি দিয়ে বস তো নাড়ুগোপাল !

—তোকে এইবার এক চড় মারব রাধু ! মেয়েটির নাম রাধারাণী।

নয় হইতে দশ—দশ হইতে এগার, এগার হইতে বার বছরের মেয়েটি এখন অনেক শিখিয়াছে। সে গৌরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

গৌর বলিল,—দেখুন—রাগ দেখুন!

রাধু তাহার অভিনয়-ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিল—না-না—সখি—সে মুখ আর আমি দেখব না গো! কালো রূপ আর হেরব না। যমুনার জল কালো—যমুনায় আর যাবো না গো! মাথার কেশ কালো—সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরীর বর্ণ কালো, নীলাম্বরী আর পরব না গো! দাও দাও—আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও!

মা তাহার হাসিয়া বলিল,—মরণ তোমার! গৌরদাস অমনি করে বলে নাকি? আর গায় কত সুন্দর—পারিস তুই?

—ছাই। ও আমি খুব পারি।

—বেরো, বেরো বলছি। পালা!

মেয়ে সত্য সত্যই পলাইয়া গেল।

মা বলিল—হ্যাঁ বাবা গোপাল, এইবার তো বড়টি হ'লে—এইবার একটা ঘর-দোর কর। রাধুর বাবা বলছিল—গৌর যদি বড় দলে যায়—অনেক মাইনে হয়। তোমার ভাবনা কি বাবা!

গৌর বলিল—অধিকারী আমাকে ঘরদোর করে দেবেন, জমি কিনে দেবেন—বলেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে? আমার বড় সাধ।

গৌর সলজ্জ মুখে নত দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিল। রাধারাণীর রঙ ফরসা না হউক—এমন দেহভঙ্গি বড় দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ তন্বী, পিঠে একপিঠ চুল—চোখের তারা দুইটি অহরহ চঞ্চল—কথা কহিবার সময় যেন নাচে!

গৌরের সলজ্জ নীরবতা দেখিয়া রাধারাণীর মা পুলকিত হইয়া উঠিল—মৃদু হাসিয়া সে বলিল—রাধুর বাপের সঙ্গে সেই কথাই হয় আমাদের। তারও ভারি

হইচ্ছে। বলে কি জান, বলে গৌরও আমাদের রাধারাণী সাজে, রাধুও আমাদের রাধারাণী—কেমন মিল হবে বল দেখি!...তা হ'লে আজ ওকে পাঠিয়ে দেব অধিকারী মশায়ের কাছে। অধিকারী মশায়ই তো তোমার মা বাপ সব!

গৌর চুপ করিয়া রহিল, খাইতে বসিয়া সলজ্জ কুণ্ঠায় পূর্ব্বের মত এবার আর চাহিয়া খাইতে পারিল না। রাধারাণীর মা অযাচিতভাবেই আরও কয়েকটা নাড়ু পাতে দিয়া বলিল—জামাই না হতেই লজ্জা আমার গোপালের।

আসিবার পথে নির্জ্জন গলির মধ্যে রাধারাণীর সঙ্গে দেখা হইল। রাধু তাহাকে দেখিয়া একপাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌর বলিল—মান বুঝি? রাগ হয়েছে?

রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ত মুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—যাঃ! তারপর দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি বুঝি শুনি নাই!

গৌরদাসের সমস্ত অন্তরটা আবেশময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল—কখন রাধারাণীর বাপ আসিবে! কোন কিছু তার ভাল লাগিল না। গ্রামের ছেলেগুলি এখন বন্ধু হইয়া গিয়াছে; তাহারা পান আনে—সিগারেট দেয়। তাহারা আসিয়া আজ ফিরিয়া গেল।

রাধুর বাপ আসিল সন্ধ্যার দিকে। অধিকারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভুর কাছে একবার এসেছিলাম আমি।

একখানা ছোট ঘরে অধিকারী, ম্যানেজার—দলের রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র তাঁর শয্যা ও আসন, ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তিনি বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন,—কি বলুন।

গৌরদাস ঘরের পিছন দিকের জানালায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার ছোট একটা ছিদ্র দিয়া সবই দেখা যাইতেছিল।

হাত জোড় করিয়া সহাস্তে রাধুর বাপ আপনার নিবেদন সবিনয়ে ব্যক্ত করিয়া

বলিল—এখন আপনার আদেশ না পেলে তো হয় না ; আপনিই তো গৌরের সব—রক্ষক বলুন রক্ষক, বাপ বলুন বাপ—সবই আপনি।

অধিকারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—প্রস্তাব কিছু অন্যায় প্রস্তাব নয়। তবে গৌর এখন ছেলেমানুষ, বালক বললেই হয়। ছেলেটি ধরুন গান করেই খায় ; কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীতবিদ্যা হ'ল—সাধনার বস্তু। সংযম নইলে সাধনা হয় না—।

রাধুর বাপ বলিল, আমার কন্যাটিও খুব বড় নয়, এই আপনার বছর বারো হবে! আপনি অনুমতি করলে—এক আধ বছর পরেই না হয়—।

তাহার কথার মধ্যপথেই অধিকারী বলিলেন, ম্যানেজার বাবু একবার বাইরে যদি যান দয়া করে—তা হ'লে···দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ!

তারপর বলিলেন—দেখুন, আপনি হলেন বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ, তার ওপর ভগবানের লীলাগান করাই হ'ল আমার ব্যবসা। আমি তো আপনাকে প্রতারণা করতে পারবো না। একটা কথা—

কিন্তু, কথাটা না বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন ; নীরবেই মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাধুর বাপও নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে-ই উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিল,—প্রভু!

অধিকারী বলিলেন—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বাবাজী ; এতদিন এ কথা গোপন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আপনি যে প্রস্তাব করছেন—তাতে আপনার কাছে গোপন রাখা চলে না। দেখুন,···একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অধিকারী বলিলেন—ছেলেটি জাতিতে বৈষ্ণব নয়!

—বৈষ্ণব নয়! তবে? রাধুর বাপ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

—সকলে অবশ্য বৈষ্ণব বলেই জানে, ছেলেটিও তাই জানে। আমি বরাবর ওই পরিচয়ই দিয়ে এসেছি। অনেকদিন পূর্ব্বে, ছেলেটির বয়স তখন ছয় কি সাত ; সেই সময় বর্দ্ধমানের পথ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলাম ওর চেহারা দেখে আর

গান শুনে। সেই বয়সেই গান গেয়ে ছেলেটি ভিক্ষা করে বেড়াত; আমার দলের জন্যে ওকে এনেছিলাম। দোকানীরা বলেছিল, ছেলেটির মা নাকি—। অধিকারী নীরব হইলেন।

বাবাজী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিল—মা নাকি?

—মানে—কি বলব? এই নাচগান করত—মানে বারাঙ্গনা ছিল।

—বেশ্যা?

—হ্যাঁ, তাই।

পিছনের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া গৌর কেমন অবসন্ন বিবশ হইয়া গেল—সে যেন পঙ্গু হইয়া গেছে।

বাবাজীও স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। অধিকারী আবার বলিলেন,—ছেলেটিকে এনেছিলাম প্রথমে স্বার্থের জন্যেই। কিন্তু এখন বড়ই মায়া হয়ে গেছে। নিজের কাছেই রেখেছি, রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুণ্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল ক'রে একটু অধিকার হ'লেই—আমি ওকে বৈষ্ণব ক'রে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্ম্মে তো জাতিকুলের বিচার বড় নয়—সে বাধাও নাই; তারপর দেখুন আপনি—

নিতান্ত অবসন্নের মত বার-কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাধুর বাপ জানাইয়া দিল—না-না—সে হয় না। আমরা জাত-বৈষ্ণব। ভেকধারী নই।

তারপর অধিকারীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে বলিল,—আপনি মহৎ লোক—আপনি আমাকে জাতিপাত থেকে রক্ষা করলেন। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল।

গৌরের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অর্থহীন; মাথার ভিতর যেন অসীম শূন্যতা নিঃশব্দ প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। বুকের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাসের মত একটা যন্ত্রণাদায়ক আবেগ নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে পীড়িত করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—বারবার মুছিয়া মুছিয়াও সে জল সে শেষ করিতে

পারিল না। তাহার মা—! সে—! এবার সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ দ্রুতপদে সকলকে এড়াইয়া—নির্জ্জন পথ ধরিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল। সে কান্না তাহার আর ফুরায় না! তাহার মা—! সে—! ছি-ছি-ছি! রাধু—রাধারাণীর কাছে সে অস্পৃশ্য!

সহসা একসময় অন্ধকার অনুভব করিয়া সে দাঁড়াইল। নির্জ্জন প্রান্তর—পিছনে অনেক দূরে উজ্জ্বল আলোগুলির উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত প্রভা অন্ধকার শূন্যলোকে জমাট সাদা কুয়াশার মত ভাসিতেছে। আশেপাশে সম্মুখে গ্রামের চিহ্নই অনুভব করা যায় না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের অন্ধকার পথেই আগাইয়া চলিল। না—ছি-ছি!

কিন্তু রাধু? রাধুও হয়তো কাঁদিতেছে! সে আবার কাঁদিল।

তারপর? কত পথ, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কত বিভিন্ন যাত্রার দলে দলে ফিরিয়া সে নিজে দল গড়িল। নামটা পর্য্যন্ত সে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান তাহার বড় ভাল লাগে। সখের যাত্রার দল তাহার ভাল লাগে নাই—সেখানে রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছিঃ! রাধা অভিমানিনী, মর্য্যাদাময়ী, রাজনন্দিনী,—ব্রজসুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মত নাচিবে! কত বড় প্রেম—কত বড় সে বিরহ—কত দুর্ব্বার সে অভিমান! ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়! রাধা—রাধারাণী—রাধু—রাধু!

একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সে বলিতেছে—না না সখি, সে মুখ আর দেখব না গো!······নীলাম্বরী আর পরব না সখি!—দাও দাও আমায় গৈরিকবাস এনে দাও—যোগিনী সাজিয়ে দাও!—তাহার কৌতুকময় কণ্ঠ আজ যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।··

এদিকে দলের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাজ-পোশাক লইয়া দল

গ্রামের মধ্যে চলিয়াছে। বেহালাদার শশী বলিল,—মূলগায়েনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাব না-কি ?

কথাটা চুপি চুপি সে ম্যানেজার ঘোষালকে বলিল।

ম্যানেজার বলিল—বোধ হয় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন! নাও-নাও—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চল গাঁয়ের ভেতর। এই দেখ—ভদ্দরলোকের গ্রাম—চ্যাংড়ামি যেন কেউ না করে! বুঝলে!

তারপর সে অধিকারীর কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে ডাকিল—মূলগায়েন! ওঃ, আপনার ইষ্ট-স্মরণ হয়ে গেল দেখছি! তা শুয়েই—কি রকম হ'ল ?

চোখ মুছিয়া মূলগায়েন বলিল—শরীরটা ক্লান্ত ছিল—আর, স্মরণে আপনি উদয় হ'লে—মানে, মনে পড়লে—কি মনে না করে থাকা যায় ?

—তা হ'লে চলুন গ্রামের মধ্যে। এরা সব চলে গেল।

ভুলু রায় ও উরুদাদা আসরটা বেশ ভাল করিয়াই সাজাইয়াছিল। চারিদিকে চারিটা ডে লাইটে আসরটা আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া ছেলের দল, তাহার পিছনে একদিকে ভদ্রলোক—অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষেরা বসিয়াছে। পিছনে মেয়েদের আসর।

পালাটা হইতেছিল—দীর্ঘ বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন – প্রভাসযজ্ঞ। বিরহিণী রাধা দ্বারকার পথের সন্ধান করিতেছেন—কোন্ পথে গেলে দ্বারকায় শীঘ্র যাওয়া যায়।

এই সময়—এতক্ষণে মূলগায়েন আসরে প্রবেশ করিল। মাথায় পাটীপাড়া ধরনের পরচুলা, তাহাতে সিঁথি। সিঁথির দুইটি শাখা চুলের রেখায় রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কানে কান, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরনে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলকবিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া সাজিয়া দূতীরূপে সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। দলের

চাকরটি পিছনে পিছনে আসিয়া পানের বাটা, পরিপাটী ভাঁজ করা একখানি গামছা রাখিয়া দলস্থ একজনকে জিম্মা দিয়া গেল। পরম ভক্তিভরে মূলগায়েন প্রণাম করিয়া বসিয়া আসরের চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল। আলোকিত আসরে সারি-সারি মুগ্ধ শ্রোতার মুখ। কিন্তু রাধারাণী কোথায়? চারিদিক সে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কই?

—উঠুন গো আপনি; গান জমেছে ভাল। আপনি উঠলে আসর আগুন হয়ে যাবে। পিছন হইতে ম্যানেজার ঘোষাল মৃদুস্বরে ইঙ্গিত দিল। সে উঠিয়া দীর্ঘ স্বর ছাড়িয়া ধরিল একখানি ধ্রুপদাঙ্গের গান। শিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠের রাগিণীর আলাপে আসর যেন ভরিয়া উঠিল।

পরদিন বিদায় লইয়া সে বাসায় ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল—দলের যে ছেলেটি রাধা সাজে—সেই ছেলেটি।

বিদায়ের কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিল—সেই উরুদাদা। ভুলু ছিল তাহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ডানদিকে বসিয়া। উরুদাদা বলিল, নাঃ অধিকারী মশায়, মনে করেছিলাম কেষ্টযাত্রা ভাল লাগবে না, তা বেশ লাগল, চমৎকার। যেমন আপনার গলা—তেমনি শিক্ষা। সুন্দর! আর রাধা,—যে ছেলেটি—এই যে এইটিই তো! বাঃ খাসা। ওর জন্যে আমরা এই আলাদা আটআনা দিলাম।

মূলগায়েন সবিনয়ে বলিল,—আপনারা মহৎ ব্যক্তি। গুণীর গুণ আপনাদের চোখে তো এড়াবে না। নাও রাধে, বাবুদের প্রণাম কর।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল—একি—এ কোন্ পথে সে আসিয়াছে? এ তো সেই আখড়ার পথ! হ্যাঁ! এই তো! কিন্তু আখড়াটা কই? বোধ হয় এইটাই! উঃ—গাছগুলি কত বাড়িয়া উঠিয়াছে! কুঞ্জবন যে বন হইয়া উঠিয়াছে!

দাঁড়ালেন যে? ছেলেটি তাহার অনুসন্ধানরত বিচিত্র দৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া মূলগায়েন বলিল—জল খাবে ?

—না, আমার তো তেষ্টা পায়নি।

তবুও একবার উঁকি মারিয়া সে দেখিল : বনান্তরালে ঘরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত, কেহ কোথাও নাই!—বনের ছায়ার নিবিড় অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখাও যায় না, বনের ঝরা-পাতা পচিয়া একটা ভ্যাপসা গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল; রাধু নাই! তুর্দ্দমনীয় একটা দুঃখের আবেগে বুকটা তাহার ভরিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে সেই চেনা গলির পথটা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে তাহাকে বিব্রত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। নাঃ, এ সঙ্কীর্ণ পথে আসা ভাল হয় নাই! ওদিক হইতে একটা স্থূলাঙ্গী বিরলকেশা স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্য পথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি; মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসঙ্কোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানেই একদিন লজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের কথা—আজও যে স্থূলাঙ্গী সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—সেও রাধু। গাছের শিকড়ে শিকড়ে ঘর জীর্ণ হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরণী গৃহিণী, সন্তানের জননী। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে—এবং মনটাও তাহার ভাল নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্ব্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা। কতবার মনে হইয়াছে—এ-ই যেন সে-ই! তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্তভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সঙ্কোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে শূন্য পথ ; পিছনে রাধুর স্মৃতি-বিজড়িত ওই আখড়ার ভগ্নস্তূপ – ওই গলিপথটা গভীর আকর্ষণে মূলগায়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ দুঃখ — রাধু নাই ! বারবার তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটির গতির আকর্ষণে চলিবার অভিপ্রায়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মূলগায়েন রাধা ছেলেটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—রাধে, তুমি আগে চল।

রাধারাণী ! রাধু না থাক রাধারাণী আছে !

কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণযাত্রার দলটি গ্রামখানি ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। গাড়ীর উপরে মূলগায়েন ও কৃষ্ণ ছেলেটির পাশে সেই রাধা ছেলেটি। মন্থর গতিতে গাড়ীটা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ছেলের দল উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পল্লীর মেয়েরা ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল ! বুড়াদের মনও আজ কাজে বসিতেছে না। রায়েদের মুলতুবী ঝগড়াটা আজ আবার সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মেয়ে রাধু ঘাট হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল ; বাতের বেদনা যেন চাগাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর কানের পাশে যেন গানের সুর বাজিতেছে। চোখ বন্ধ করিলে ভাসিয়া উঠিতেছে— যাত্রার ছবি ; রাধা বলিতেছে—না—না—সখি—!

কিন্তু চোখ খুলিলে—কই ? কোথায় ?

হরপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সমস্ত রাত্রিটাই তাহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই—তাহার উপর ভোর না হইতেই জানালার পাশে কতকগুলা ঘোড়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিরক্ত হইয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা থাকিলেও বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার উপায় নাই। অন্ধকার ঘর, তাহার উপর নূতন বাড়ী—ঘরের মেঝের উপর রাজ্যের জিনিস স্তূপীকৃত হইয়া আছে, কোন কিছুর উপর পা পড়িলেই সর্ব্বনাশ। কয়টা বাজিয়াছে, সেও কিছু বোঝা যায় না। তাহার নিজের বাড়ীতে বিছানাতে বসিয়াই দেওয়ালে হাত দিলে আলোর সুইচটায় হাত পড়িত, সেখানকার প্রতি পদক্ষেপের ভূমিটুকুর সহিত তাহার নিবিড় পরিচয় ছিল। তাহার নিজের জন্ম সেই গৃহে—তাহার পিতার জন্মও সেই গৃহে—তাহার পিতামহের কত সাধের বাসভবন। হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দেনার দায়ে সেই বাড়ী ভাড়া দিয়া সে নিজে এই ছোট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। দশ বৎসর মহাজন বাড়ীখানা ভাড়া খাটাইয়া নিজের প্রাপ্য শোধ করিয়া লইয়া তাহাকে বাড়ী ফেরত দিবে। তবুও লোকটাকে ভাল বলিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও দেনা শোধ লইবার জন্য বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানীর ভার লইয়াছিল! কিন্তু সে দেনা শোধ হইল কি-না সে হিসাব আজও হয় নাই। তাহার মনে পড়িল—

The system of Double Government proved a failure. The authorities in England now resolved to take on themselves the entire care and management of Bengal (1770), when a terrible famine devastated Bengal and

carried away nearly one-third of its entire population
(ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)!

শেষ রাত্রির হিম-কাতর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া ষ্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! বাড়ীর অনতিদূরেই আদালতঘাট ষ্টীমার-ষ্টেশন। প্যালেজা-ঘাট হইতে ষ্টীমার আসিল! রাত্রি তাহা হইলে চারিটা! ষ্টীমারের চাকার জল আলোড়নের শব্দও শোনা যাইতেছে। যাত্রীদের কলরব উঠিতেছে। মশারি তুলিয়া হরপ্রসাদ বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার জন্য পা বাড়াইল। এ কি! কিসে পা ঠেকিল? সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো মেঝের উপর কোন ধাতুপাত্র সশব্দে গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

—কে গো? কে গো?

অপরাধীর মত মৃদুস্বরে হরপ্রসাদ উত্তর দিল,—আমি!

—তুমি? পরক্ষণে ছায়া কঠোরস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বাপরে বাপরে বাপরে, রাত্রেও কি শান্তিতে ঘুমুতে দেবে না তুমি? উঃ, কি অদৃষ্টই আমার! বলিতে বলিতেই ক্ষোভের মাত্রা তাহার বাড়িয়া উঠিল—সে সশব্দে আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি কপালে!

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল; ধাতুপাত্রটার শব্দ-ঝঙ্কারের রেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন বায়ুতরঙ্গের ভিতর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। ইতিহাসে যদি এম-এ-টা সে দিতে পারিত, তবে হয়ত ইতিহাসের মাষ্টার না হইয়া ইতিহাসের প্রফেসর হইত। আজ দেনার দায়ে বাড়ী ছাড়িতে হইত না।

রাজপথে অশ্বক্ষুরধ্বনি বাজিয়া উঠিল—ষ্টীমার-ঘাটের যাত্রী লইয়া এক্কাগুলা রেলষ্টেশনে চলিয়াছে। এই এক্কাগুলি একটা রহস্যময় যান। এত কাল চলিয়া গেল—কত বিচিত্র আকারের কত উন্নত প্রকারের যান আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু উহারা আজও টিকিয়া আছে। এই স্প্রিংগুলি যদি না থাকিত আর মাথার উপর

ছত্রি থাকিত তবে ওই গাড়িতে চড়িয়া (Reign of প্রিয়দর্শী) অশোক দি গ্রেটের রাজত্বকালে যাওয়া যাইত। He is one of the greatest kings in the whole world! (273 B. C.)—দু হাজার দুশো দশ বৎসর পূর্ব্বে—উঃ।

বাহিরে আবার ঘোড়াগুলা চীৎকার করিতেছে! এক্কার আড্ডা না-কি?

ছায়া আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমন্তের লক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন অথচ ধীরে ধীরে বহিতেছে। হরপ্রসাদ সন্তর্পণে পা বাড়াইল। না, কিছু নাই—এখানেও কিছু নাই! ধীরে ধীরে নির্ব্বিঘ্নে এবার সে জানালার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। জানালার কপাট ও বাজুর ফাঁকে একটা দীর্ঘ আলোক-রেখা দেখা যাইতেছিল। ঐ অস্পষ্ট আলোকের দীর্ঘ সরল রেখাটাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে ডাকিতেছিল। এবার কয়টা ছাগল ডাকিয়া উঠিল। হরপ্রসাদ সন্তর্পণে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। শেষ ডিসেম্বরের তীক্ষ্ণ বাতাসে মুখের চামড়ায় যেন সূচ ফুটাইয়া দিল, কিন্তু তবুও নির্ম্মল বাতাসের অমৃত আস্বাদে বুকের ভিতরটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বাহিরে দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে আলো অন্ধকারের কুহেলিতে ঢাকা পৃথিবী আচ্ছন্নের মত স্তব্ধ।

ও, এটা জানোয়ারের হাসপাতালের একটা শাখা। প্রকাণ্ড একটা হাতার মধ্যে কয়টা চালা, আস্তাবলের মত অপরিসর অথচ লম্বা ঘরে কয়ভাগে বিভক্ত—ওইটায় বোধ হয় ঘোড়াগুলা থাকে। কাছেই এ চালাটায় গরু রহিয়াছে। গরুগুলির পিঠে চট চাপানো—সম্মুখে খুঁটিতে একটা বোর্ডে কাগজ ঝুলিতেছে। গরুগুলির গলায় একটা করিয়া তক্তি, নম্বর লেখা রহিয়াছে। মধ্যে একটা ছোট পাকাঘর, কি লেখা রহিয়াছে দেবনাগরী হরফে?—পাটলীপুত্র জানবারকা হাসপাতাল!

হরপ্রসাদের মনে পড়িয়া গেল—

Formerly hundreds of animals were killed for the

royal kitchen, but Ashoka put a stop to it. He also established hospitals for the beasts.—Ashoka the Great! এইখানেই হয়ত প্রিয়দর্শী-প্রতিষ্ঠিত পশুচিকিৎসালয়ের ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। গঙ্গা, শোন, গণ্ডক ও পুনপুনের বন্যার পলি-পাটিতে গৌরবময় পাটলীপুত্র ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেছে। মহামানব শাক্যমুনি অজাতশত্রুর নবদুর্গ-প্রাকারের দিকে চাহিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন—আনন্দ, এইখানে এক মহানগরী গড়িয়া উঠিবে। অগ্নিদাহ অথবা জলপ্লাবনে কিন্তু সে নগরী বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে!

মৌর্য্য, সুঙ্গ, কন্ব, গুপ্ত, তারপরই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন শতাব্দী—Dark age; এই Dark age-এর ইতিহাস যদি কোনরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায়—

—বলি, হ্যাঁ গা, তুমি কি ধারার মানুষ? এই শীতের ভোরবেলা জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছ? শীতের বাতাসে যে হাড়সুদ্ধ কনকনিয়ে গেল! ছেলেগুলো হি হি ক'রে কাঁপছে! বাপরে বাপরে!

তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হরপ্রসাদ বলিল—আর ঘুমোয় না, ওঠ না, বেলা হয়েছে। ছেলেরাও বরং উঠে একটু বেড়িয়ে আসুক।

—হ্যাঁ, শাল দোশালার ত অভাব নেই—গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে আসবে! ওই ত একটা ক'রে রদ্দি গরম জামা—নামেই গরম, ওই প'রে যাক, গিয়ে বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাণ্ড বাধিয়ে আমার মুণ্ডপাত করুক।

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিল। ছায়া এবার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল—নাও, জানালাটা খোল দেখি, কি ভাঙলে একবার দেখি! খোল না!

হরপ্রসাদ জানালাটা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিল। সৌভাগ্যটা ছায়ার অথবা হরপ্রসাদের সেটা সূক্ষ্ম বিচারসাপেক্ষ, সৌভাগ্যক্রমে কোন কিছুই ভাঙে নাই। ছায়া কিন্তু বলিল—আমার সাতপুরুষের পুণ্যির জোর যে কিছু ভাঙে চোরে নাই।

কিন্তু তুমি কি মানুষ বল ত, জীবনে শেষ রাত্রের ঘুম যে কি আরামের, তা একদিন ঘুমিয়ে দেখলে না ? সমস্ত জীবনটাই পড়ুয়া ছেলের মত ভোর রাত্রে পড়া মুখস্থ করা। তাও যদি পাঁচ পাঁচবার এম-এ ফেল না হতে।

হরপ্রসাদের আর সহ্য করিবার শক্তি ছিল না, সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছায়া কিন্তু ক্ষান্ত হইল না, সে আপন মনেই বলিয়া চলিল—পাঁচবারে কম করে পাঁচশো টাকা জলে গেল! যদি মানা করব ত চল্লিশ বছরের বুড়োর চোখ দিয়ে নোনাপানি ঝরতে আরম্ভ করবে!

বাহিরে তখন বেশ আলো ফুটিয়াছে। হরপ্রসাদ ইতিহাসের নোটখানা লইয়া বসিল।

এইবার চশমা দরকার, দৃষ্টিশক্তি সত্যই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতরে ছায়া তখনও বিষ ছড়াইতেছিল সামনে মেয়ের বিয়ে! মানুষের যদি কোন চেষ্টা থাকে! আমি কিন্তু একখানি গহনা চাইলে দেব না। ওই পাঁচ শো টাকা থাকলে আজ মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভাবতে হয়!

হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জীবনে ঐ এক দুর্ভাবনা। বল্লাল সেন-কৌলীন্য! ঝুনু অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে, চৌদ্দ-বৎসর পার হইয়া পনেরোয় পা দিয়াছে। বাল্যকালে ঝুনুকে যে দেখিয়াছে সে-ই বলিয়াছে, এ মেয়ের জন্য রাজপুত্র নিজে আসিয়া সাধিয়া বরমাল্য লইবে। ঝুনু সত্যই সুন্দরী মেয়ে। সাধ করিয়া হরপ্রসাদের মা ঝুনুর পায়ে তোড়া গড়াইয়া দিয়াছিলেন—আদর করিয়া বলিতেন, রাঙা পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজে। সেই রুনুঝুনু হইতে তাহার নাম ঝুনু। ঝুনুর ভাগ্যফলও নাকি খুব ভাল। যে তাহার রক্তাভ করতলখানি দেখিয়াছে সে-ই সে কথা বলিয়াছে।

কিন্তু সব মিথ্যা, ভাগ্য অ-দৃষ্ট; গণনা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। History repeats itself—বাঙলার কুলীনের ঘরের মেয়ের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হইতে চলিয়াছে।

তবে মেজর গুপ্তের অ্যাসিষ্টাণ্ট ছেলেটি যদি হয়—হোক ছোট ডাক্তার, সংসারে নিরাশ্রয়,—তবুও ঝুনুকে ভাগ্যবতীই বলিতে হইবে।

খাইতে বসিলে সে কথাটা ছায়াও মনে করাইয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এ ছায়া যেন সে ছায়াই নয়—সে যেন অকস্মাৎ মায়া-মমতা-পরিপূর্ণা কায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে। হরপ্রসাদ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না; কারণ তাহাদের জীবনে এইটাই স্বাভাবিক। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবনে বিরোধ নামিয়া আসে দুঃস্বপ্নের মত।

ছায়া বলিল—আজ একবার ছেলেটির খোঁজ করে আসবে, কেমন?

হরপ্রসাদ উত্তর দিল—হ্যাঁ, সে কথা আমিও ভাবছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় যাব।

ছায়া ম্লান হাসিয়া বলিল—বেশ, সন্ধ্যেবেলা পড়ার ভূত আবার ঘাড়ে চাপবে না ত?

—না। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ের আগে ত পড়া নয়।

—তা দিনের বেলা ত গেলে পার।

—ছেলেটির কর্ত্তা হলেন মেজর গুপ্ত। তিনি সায়েব মানুষ, বড় ডাক্তার—তাঁর সময় বুঝে ত যেতে হবে।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পড়াশোনাও আর বাদই দিলাম। কি হবে মিথ্যে পরিশ্রম করে? পাঁচবার ত হ'ল—আর কেন?

ছায়াও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমারই অদৃষ্ট, তোমার দোষ কি বল? তুমি ত চেষ্টার কসুর কর নি। আজ সতের বছর বিয়ে হয়েছে আমার, একদিনের জন্যে বারোটা একটার আগে তুমি বিছানায় শুলে না, আর তিনটের পর বিছানায় থাক নি! বইএর পাতায় আর মুখে! সমস্তই আমার অদৃষ্ট।

সত্য কথা। হরপ্রসাদের অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। আই-এ পাস করিয়া সে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিল—তারপর প্রাইভেট পড়িয়া বি-এ পাস করিয়াছে—

সেও চারবারের ব্যর্থ উদ্যমের পর পঞ্চম বারে। তারপর পাঁচবার এম-এ হইয়া গেছে।

খাইয়া উঠিয়া হরপ্রসাদ বাহিরে আসিল ছেলেদের খোঁজে। এখন বড়দিনের ছুটি—একটুখানি নজর না রাখিলে তাহারা সমস্ত দুপুরটা হৈ-হৈ করিয়া ফিরিবে। বাহিরে রাস্তার ধারে বারান্দায় ছেলেদের সাড়া পাওয়া গেল। হরপ্রসাদ সেখানে আসিয়া শুনিল—ছেলেদের মধ্যে তখন মোটরকার লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

—সুন্দর মোটরখানা, না দাদা? 3245 নম্বর।

দাদা উত্তর দিল—এখানকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল মোটর হচ্ছে সিটির শেঠজীর—রোল্‌স্‌রয়েস্‌—ত্রিশ হাজার টাকা দাম—নম্বর হ'ল 1627—

হরপ্রসাদ বলিল—1627! বলতে পার মণ্টু 1627 A. D. Indian Historyতে কিসের জন্য বিখ্যাত?

মণ্টু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ভারতের ইতিহাস খুঁজিতে আরম্ভ করিল। হরপ্রসাদ বলিল—এস, সব ঘরের মধ্যে এস। ইতিহাসের গল্প বলব!

ঘরের মধ্যে বসিয়া হরপ্রসাদ বলিল—পারলে না বলতে? এ অত্যন্ত অন্যায় কথা! দেখ, মন দিয়ে না পড়লে এই হয়। A great man—A great king—বিখ্যাত রাজা এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবু পারলে না?

ক্রমশ সে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল,—আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, তুমি ইতিহাসে পাশ হও কেমন ক'রে! নিশ্চয় তুমি চুরি কর। I am sure—তুমি কখনও ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে না! ছত্রপতি শিবাজীর নাম তুমি মনে করতে পার না! Chhattrapati Sivāji was born in 1627. From the humble position of a Māwāli Sardār he rose to be the master of an independent kingdom. He must be reckoned as one of the greatest heroes of Indian history.

ছোটরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, একজন বলিল—গল্প বললেন না?

—গল্প? হ্যাঁ, সেই ত বলছি। ভারতবর্ষে তখন মোগল রাজত্ব। সম্রাট শাহজাহান তখন দিল্লীর সম্রাট। তাজমহলের নাম শুনেছ? শুনেছ! আচ্ছা! সেই তাজমহল তিনি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন over the grave of his beloved queen Mumtāz Mahal—Tājmahal is the finest of all buildings of the world—a veritable wonder of the world. শুধু তাই নয়—শাহজাহান আরও অনেক ভাল ভাল বাড়ী তৈরী করেছিলেন, মতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, দেওয়ানী খাস—একটা নূতন শহরই তিনি নির্ম্মাণ ক'রে গেছেন শাহজাহানাবাদ নাম দিয়ে। বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন—এ কি, এটা যে ঘুমিয়ে পড়ল! এটাও ঢুলছে!

যাহারা জাগিয়া ছিল, তাহাদের একজনে সভয়ে বলিল—শ্রিবাজীর কি হ'ল বাবা?

—হ্যাঁ বলি। মোট কথা the artistic achievement of the Mughals reached its high-water mark of greatness and glory during his reign—মানে, শাহজাহানের। আচ্ছা শাহজাহান আর আকবরের চরিত্র তুলনা ক'রতে পার তুমি মণ্টু? আকবর ছিলেন the greatest of the Mughal Emperors—an Empire builder—চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কানানৌর নামক স্থানে তাঁর 'করোনেশন' হয়—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। জন্ম হয়েছিল ১৫৪২-এর ২৩শে নবেম্বর অমরকোট শহরে। তাঁর বাপ হুমায়ুন তখন রাজ্য হারিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পাঠানবীর শেরশাহ তখন দিল্লীর সম্রাট হয়েছেন। তাঁর বাড়ী ছিল কোথায় জান?—সাসারাম। এই আরা জেলায় সাসারাম ব'লে একটা জায়গা আছে। আরা থেকে সাসারাম পর্য্যন্ত লাইট রেলওয়ে আছে—সেই সাসারামে সামান্য একজন জমিদারের ছেলে ছিলেন শেরশাহ, বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফরিদ।

প্রবল উৎসাহের সহিতই ইতিহাসের আলোচনা চলিতেছিল। বেলা তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, ঝুনু আসিয়া আলোচনায় বাধা দিল। হরপ্রসাদ তখন মুসলমান রাজত্ব শেষ করিয়া হিন্দুরাজত্বের দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। তিরৌরির দুইটা যুদ্ধ পার হইয়া সংযুক্তার স্বয়ম্বর-কথা—হরপ্রসাদ বলিতেছিল, দ্বাদশ শতাব্দীর—মানে Twelveth Century A. D র—মধ্যভাগে—কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভাও আহ্বান করেন। কিন্তু—

ঠিক সেই সময়েই ঝুনু আসিয়া বলিল—আজ ত আপনি পড়াতে যাবেন না বাবা?

চকিত হইয়া হরপ্রসাদ বলিল—কে বললে?

—মা বললেন।

একটু চিন্তা করিয়া হরপ্রসাদ বলিল—না, কাল ১লা জানুয়ারী New year's day, কাল যাব না। আজ যেতে হবে।

ছায়া নিকটেই ঘরের মধ্যে ছিল, সে এবার আসিয়া বলিল—গুপ্ত সাহেবের ওখানে যাবে বলেছিলে যে?

হরপ্রসাদের মনে পড়িয়া গেল—হ্যাঁ-হ্যাঁ! কিন্তু কাপড়-চোপড়গুলো একটু··· ।—সে নিজের কাপড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ছায়া বলিল—সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি। ঝুনু মা, তোমার বাবার জুতোটা একটু পরিষ্কার ক'রে কালি দিয়ে বুরুশ ক'রে দাও ত।···পয়সা কত দেব? একটা টাকা দিয়ে দিই। গুপ্তসাহেবের বাড়ীর একটু আগে থেকেই একখানা গাড়ী ক'রে নেবে, বুঝলে?

কথাটা হরপ্রসাদের মন্দ লাগিল না। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা আছে। কে যেন নিষ্ঠুরতার সহিত পরিহাস করিয়া সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দেয়। কাপড়চোপড় বদলাইয়া হরপ্রসাদ বাহির হইয়া খানিকটা পথ

গিয়াছে, এমন সময় মণ্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—মা বললেন টাকাটা ফিরিয়ে দিন।

হরপ্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মণ্টু বলিল—রমণীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা এসেছেন; জলখাবার আনাতে হবে—মা বললেন আপনার কাছে টাকা চেয়ে নিতে।

রমণীবাবু হাইকোর্টের উকিল—তাঁহার গৃহিণীর সহিত ছায়ার প্রীতিসম্ভাব আছে।

হরপ্রসাদ টাকাটা মণ্টুর হাতে দিয়া মাথা হেঁট করিয়া পদব্রজেই অগ্রসর হইল।

মেজর গুপ্ত খাঁটি সাহেব, ঢিলা পাজামার উপর গরম ড্রেসিং গাউন পরিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। হরপ্রসাদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গুপ্ত সাহেব বলিলেন, Well, এসেছেন আপনি! কিন্তু কি নামটি আপনার বলুন ত?

সবিনয়ে হরপ্রসাদ বলিল—আজ্ঞে—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ব্যানার্জ্জী! সৌরীন হ'ল চ্যাটার্জ্জী, তা হলে ত বিয়ে হতে পারে, good!

হরপ্রসাদ আশান্বিত হইয়া বলিল—আপনার অনুগ্রহ হলে—

বাধা দিয়া গুপ্ত সাহেব বলিলেন—অনুগ্রহ কী আছে এতে? অনুগ্রহের কথা মোটেই নয়।

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিল, সঙ্গত উত্তর কি তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। গুপ্ত সাহেবই আবার বলিলেন—কি করেন আপনি?

—আমি স্কুলে শিক্ষকতা করি।

—শিক্ষক—Teacher? কোন্ teacher আপনি? কত মাইনে?

—আমি 2nd Assistant, ষাট টাকা মাইনে পাই।

—হুঁ। গুপ্ত সাহেব খানিকটা চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—কি দিতে পারবেন আপনি?

হরপ্রসাদ এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে বিস্মিত হইয়া গেল। তবুও সবিনয়ে বলিল—আমার সাধ্য অত্যন্ত অল্প।

গুপ্ত সাহেব বলিলেন—আপনার সাধ্য আর সৌরীনের প্রয়োজন এই দুয়ে একটা কম্প্রোমাইজ না হলে ত বিয়ে হতে পারে না। আপনি নিশ্চয় জানেন, সৌরীনের কেউ কোথাও নেই, বাড়ীঘর পর্য্যন্ত নেই, আমার charityতে মেডিকেল স্কুলে পড়েছে। এখন তার জীবনে একটা starting চাই। অন্তত দু হাজার টাকা—একটা ডিস্‌পেন্সারী করতে হাজার খানেক—আর গয়না and other expenses—এও হাজার টাকা, বুঝলেন ত!

হরপ্রসাদ বিহ্বলের মত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, সে বুঝিয়াছে।

কিন্তু গুপ্ত সাহেব বোধ হয় সন্দেহ করিলেন। তাহার পরও তিনি পুরা দুইটি ঘণ্টা হরপ্রসাদকে সৌরীনের দুই হাজার টাকা প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—কেমন, পারবেন দিতে আপনি?

হরপ্রসাদ সবিনয়ে স্বীকার করিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই কোন রকমে দেব আমি। গুপ্ত খুশী হইয়া বলিলেন—Good! anyhow দিতেই হবে। উপায় কি? মেয়ে-জামাই ত আপনারই।

হরপ্রসাদ গুপ্তসাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া দেখিল পথে পথে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপথের দুই পাশের দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার ঝকমক করিতেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা তাহার মনে হইল—সে করিয়াছে কি! দুই হাজার টাকা সে কোথায় পাইবে? বাস, এক্কা, মানুষের দ্রুতধাবমান স্রোতের মধ্যে নিশ্চল হইয়া সে যেন ফুটা নৌকার মত তলাইয়া যাইতেছে!

—বঁচ যাইয়ে—বঁচ যাইয়ে বাবু! আঃ—কৈসন আদমী হ্যায় আপ?

একখানা এক্কা প্রায় তাহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল! হরপ্রসাদের যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে জনাকীর্ণ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া

গঙ্গার ধারে নির্জ্জন পথ ধরিয়া একটা প'ড়ো বাগানের মধ্যে আসিয়া বসিল। কতকালের পুরাতন বাগান—মধ্যে ভাঙা একটা চিম্‌নী, বোধহয় কোন কালে কোন মিল ছিল। চারিদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সে বসিয়া রহিল। রাত্রি আসিয়াছে—ছায়া মূর্ত্তিমতী অশান্তির মত তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার উপর এই দুই হাজার টাকার সংবাদ বহন করিয়া বাড়ী যাইবার সাহস তাহার নাই।

এ যুগ হিন্দু-যুগ হইলে রাজার দরবারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইলে—মহারাজ অশোক, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন সর্ব্বস্ব, এমন কি পরিধেয় পর্য্যন্ত দান করিয়া ভিক্ষুর চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাসাদে ফিরিতেন। হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সহসা একটা তীব্র আলোকে তাহার চোখ ঝলসিয়া গেল। বাগানটার পাশের রাস্তা দিয়া একটা মোটর আসিতেছে—তাহারই আলো। কত নম্বর—৫৬—নাঃ —নম্বরটাও পাওয়া গেল না, ৫৬, তারপর আর একটা অঙ্ক! তীব্র গতিতে মোটরটা স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেছে!

স্থানটা আবার গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে। অন্ধকারে আকাশের দিকে চাহিতেই হরপ্রসাদ চমকিয়া উঠিল। দীর্ঘ স্তম্ভটা কাল-রেখার মত দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহার মনে হইল ওটা ৫,৬,৭—পাঁচশো সাতষট্টি! অশোকস্তম্ভ, গৌতম বুদ্ধ—লুম্বিনী উদ্যান—। কিন্তু কই কোন সদ্যোজাত শিশু ত কাঁদে না? আকাশে অন্ধকার—পূর্ণচন্দ্র ত নাই! প্রসবযন্ত্রণা-কাতরা মহামায়া কোথায় বৃক্ষতলশায়িনী?—হরপ্রসাদ আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

কোথা হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ হয় ইউরোপীয়ান ক্লাব হইতে।—আজ রাত্রি বারোটা অবসানেই নববর্ষ আরম্ভ হইবে। রাজপথের কোলাহল আর শোনা যায় না। রাত্রি হয়ত অনেক হইয়াছে। হরপ্রসাদ চঞ্চল হইয়া এবার উঠিল। ওঃ, সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল! জনহীন রাজপথ। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দিকে চলিল। মনকে সে শীতরাত্রির মত শীতল করিয়া

জ্বলিতেছিল। ছায়ার রোষবহ্নি সব যেন সে হিমবর্ষণে নিভিয়া যায়। হে গৌতম বুদ্ধ! যুগে যুগে তোমার করুণা মানুষ পাইয়াছে, আমি কি পাইব না?

ও কি?—একটা গম্ভীর গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল—শব্দটা এখনও গঙ্গার কূলে কূলে, রেলওয়ে ষ্টেশনের গতিহীন মালগাড়ীগুলায় ধাক্কা খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে। আবার!—ও! বারোটা বাজিয়াছে,—নববর্ষের তোপ পড়িতেছে! নববর্ষ তাহার জন্য কী আনিতেছে? দুঃখ—অভাব—অশান্তি—History repeats itself!

দরজায় হাত দিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ! সে শঙ্কিত হইলেও নিরুপায় হইয়া ডাকিল—মণ্টু! ঝুনু!

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলিয়া গেল। ছায়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—এস! গরমজল ঠাণ্ডা হয়ে এল। হাত পা ধুয়ে নাও। আমি ষ্টোভটা ধরিয়ে ময়দা মাখা আছে লুচি ভেজে দি।

নির্ব্বাক হইয়া হরপ্রসাদ ছায়ার অনুসরণ করিল। ছায়া আবার প্রশ্ন করিল—ওখানে কথা পাকা করনি ত?

সভয়ে হরপ্রসাদ বলিল—দু হাজার টাকা চায়।

—দরকার নেই ওখানে। ঝুনুর আমার বরাত ভাল, আজ রমণীবাবুর বউ এসেছিলেন—তাঁর ভাইপো—ছেলে বি-এ পাশ—জমিদারী আছে—এক পয়সা নেবে না। ছেলেটি দ্বিতীয় পক্ষ—কোন ছেলেপুলে নেই—বয়সও বেশী নয়—তিরিশ। সে এখানে কখন এসেছিল—রমণীবাবুর বাড়ীতেই ঝুনুকে দেখে গেছে। নিজেই সে পিসীকে বিয়ের কথা লিখেছে। এখন তোমার মত হ'লেই পাকা হয়ে যায়।

হরপ্রসাদের চিত্তটাও অকস্মাৎ পুলকিত হইয়া উঠিল—সে উৎফুল্ল হইয়া ছায়ার দিকে চাহিল—ছায়া তখন ষ্টোভ জ্বালিতেছে। সে দেখিল ছায়া আজ সাজিয়াছে! সে আজ তরুণী হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল—তোমাকে কিন্তু মানিয়েছে বড় সুন্দর!

ছায়া বলিল—কি মানুষ তুমি! এতক্ষণে বুঝি সেটা খেয়াল হ'ল? রমণীবাবুর বউ আমার চেয়ে বড়—তার সাজ যদি দেখতে! আর মেয়ের বিয়ে আসছে—একটু সাজ-গোজ ক'রে নিই! এমন আর কি বুড়ো হয়েছি আমরা! বলিয়া সে একটা কি আনিতে উঠিয়া গেল। কত কথা হরপ্রসাদের মনে হইল! সুখ আর দুঃখ, দুঃখ আর সুখ—এতেই কত বৈচিত্র—ইতিহাসে এ বৈচিত্রের প্রাণ নাই।

হরপ্রসাদ আপন মনেই বলিয়া উঠিল—This is the history cf individual life—every-day life, but it is never told—সুখ আর দুঃখ—it is always repeating itself—

—কি বকছ আপন মনে? ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, সহসা কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া হরপ্রসাদ বলিল—ঝুনুর ত ভাল নাম হয়নি?

—না। কতবার তোমায় বলেছি! কিন্তু ভাল একটা নাম ওর আর হল না। এইবার একটা ঠিক কর, ঝুনু নামে ত বিয়ে হবে না!

মুহূর্ত্তে হরপ্রসাদের মন কোন্ অতীত লোকে চলিয়া গেল—সে বলিল—নাম থাকুক সুভদ্রাঙ্গী। নাতির নাম রাখবো অশোক।

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্ত্তমান ; ছাতি-ফাটার মাঠ ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় ; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্ব্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ ! ক্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না ; কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম ; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা-পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে-নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জ্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতিফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জ্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্ব্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা' অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরণা জাতীয় জলা। ঐ জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে—তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই তিনটা বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সের খানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ী ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্দ্ধেক বিক্রী করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ী ফিরিয়া আর এক বার বাহির হয় শুক্‌নো গোবর ও দুই চারিটা শুক্‌নো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ী এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ী সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে এ কথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া

লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জ্জন-রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে! নির্জ্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে! ঐ সর্ব্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মত লক্‌লকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে! না হইলে সেও তো মানুষ!

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে! বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চক্‌চকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত! ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোল নাক—চোখ দুটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত, কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত; ছোট চোখ দুটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত আকাশের কোল পর্য্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়! অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুণ দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না! কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায় :

বুড়াশিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রাণার উপর সে দাঁড়াইয়াছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মত দশ এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ীর হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেল্‌ব হারামজাদীকে?

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

—আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল—তবে সে কথা বল্‌লি নে কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ,—লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

—হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ-যে সত্য তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—সে হারু সরকারের বাড়ী গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল ক'রে দাও, ওকে ভাল ক'রে দাও! কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম! আশ্চর্য্যের কথা—কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল—ওকে একটা আম আর—দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল—ছাই দেব হারামজাদীর মুখে ; মা-বাপ মরা অনাথা মেয়ে ব'লে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল—কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নে। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি—আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দৃষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীর দাওয়ায় শুইতে পারে নাই ; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়াশিবতলায়। অঝোর-ঝারে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টি ভাল ক'রে দাও, না হয় আমাকে কানা ক'রে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির-মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্ব্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে—গৃহস্থের বাড়ীতে সে আর ঢুকিবে না, কিছুতেই ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না—কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত—দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

—কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার।

—না মা! ঘরে ঢুকব না মা!

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে! কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা—হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

—এই-এই ! হারামজাদী, বেহায়া—উঁকি মারছে দেখ—সাপের মত !

ছি ছি ছি ! সত্যিই ত সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালের সমস্ত আয়োজন আহার নরুণ-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে ! মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরণার মত জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির-মূর্ত্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া তুলিয়া উঠিল ; ফাটধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল ; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায় !

কিন্তু সে তার কি করিবে ? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে—তার কি করিবে, কি করিতে পারে ? প্রহৃত পশু যেমন মরীয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ আঁ গর্জ্জন করিয়া উঠে ঠিক তেমনি একটা ই ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস—বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে ! একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধূলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মত ওটা কি ? নড়িতেছে যেন ; মানুষ ? হ্যাঁ মানুষই ত ! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া ? হি হি হি করিয়া পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। একটা অবোধ্য নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না না না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধূলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ—ওদিকে সে আর চাহিবেই না। তার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলোকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো করা পাতাগুলো ফর ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্ত্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জ্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা-গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো!

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্ত্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্ত্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে! একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন্ অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার

শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে!

—কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মতই বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল—কে?

ধূলিধূসর দেহ, শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল—মেয়েটির শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আহা-হা বাছারে! আয়, আয়! বোস!

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল—একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া একটুকরা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল—আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কি ব'লে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল—আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তুক এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে!

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্ম্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল—দে দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে! মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল ; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম, সরস, দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে !

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে ! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে ! চোখদুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে ! তবে কি···? কিন্তু সে তাহার কি করিবে ? কেন তাহার সম্মুখে আসিল ? কেন আসিল ? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া···, জীর্ণ জর জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে ! এঃ, ঘামে ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ ! যাঃ ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্ত্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল—খেয়ে ফেললাম ! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে ! পালা পালা—তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি !

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল ; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এটা তবে রামনগর ? তুমি সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে ? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি ! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে ? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না—সে তাহা জানে ; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে

দেখিবে কি করিয়া ? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে ; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি !

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে ত অনেকটা ডাগর হইয়াছে ! তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্ব্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি !

ঠিক এমনি ভাবেই—ঠিক এই আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া, নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল—বলি ওলো—ও আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবী-সাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস ! আমার বাছার যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ !

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল—বেরো বলছি বেরো ! হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি !

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্ব্বল শরীরে থর থর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার-বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি ! তাই নাকি সে পারে ? হইলই বা সে ডাইনী,—কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে ? ছি ছি ! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—

তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দিয়া প্রমাণ করিয়া দিও সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি।

কিন্তু অপরাহ্ণ বেলা হইতে-না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার-বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার-দুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেইদিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দ্দশীই ছিল, হ্যাঁ চতুর্দ্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবী-তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমায় আগের প্রতি চতুর্দ্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করে দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন যেন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশ লোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল—সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর

ধূলার গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ-গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে-ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে-ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্ব্বনাশী! মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে—কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো! আমি কি করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঐ ঝরণাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুলিয়া উঠিল—সে তাহার কি করিবে। সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরস লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে! কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিতে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে—বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই! এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা

পাখী অশ্রান্ত ভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল! আমগাছ-গুলির মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরণার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে! আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউড়ীদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা—আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউড়ী ছেলেটা!

মেয়েটা বলিতেছে—না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল—হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক! তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেনে থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে—তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়ীতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা! কি? কি বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল্ তোতে আমাতে ভিন্‌গাঁয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পাতব! তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি মেয়ের ছবি! একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট! চোখ দুটি ছোট—তারা দুটি খয়রা রঙের—কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না ত তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনদিন দেখে নাই। আরে, তুই আবার কে রে? কোথা

থেকে এলি ? লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দ্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢংটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি ?

—আমার কি ? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস—কিল ? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটার দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত শক্ত নিটোল শরীর ! জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোন উত্তর না দিয়া তীব্র তির্য্যক্ ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বদিকে চুনে হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল ; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই ; ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল ; সেই লোকটা ! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল ; হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত। সে বলিয়াছিল—কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে ?

সে বলিয়াছিল—এই দেখ, তুমি যাও বলছি—নইলে আমি চেঁচাব।

—চেঁচাবি ? দেখেছিস পুকুরের পাঁক—টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে !

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

বসিয়া ছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল—ধ্যো-ৎ।

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি হি করিয়া সে কি হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল—দূর-রো ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ!

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল—তুমি মারবা না কি?

—না না, মারব কেনে? তোকে শুধালাম কোথা বাড়ী তোর, তু একেবারে খ্যাক ক'রে উঠলি! তাথেই বলি—।

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমার বাড়ী অ্যানেক ধুর, হুই পাথরঘাটা!

—কি নাম বটে তোর? কি জাত?

—নাম বটে আমার 'সোরধনি'—লোকে ডাকে—'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশি হইয়া বলিয়াছিল—আমরাও ডোম! তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল; সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—কি বলিবে?

—রাগ ক'রে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—না।

—তবে?

—আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

—বিয়ে করিস না কেনে? বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে, কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তার পর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে; মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙ্গিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্ত্তা ত আর শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর এমন নিরিবিলি জায়গা কোথায়? এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না! তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালবাসায় কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল; আচ্ছা ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল—না না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ ত ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয় এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে—জানিলে কিন্তু ভাল হইত! গাছের উপর

বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত! কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না! উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে—আসিবে রে, সে আসিবে!

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সেই জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়া ছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

—এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে ব'সে আছি!

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা—সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাই বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সেদিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—কাল তোর মুড়ি প'ড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দ্দান্ত লোভ—সাপের মত তাহার ডাইনী মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল? হ্যাঁ, মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না পারে? ও মাগো! ঠিক তাই; এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল—ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি 'সরা' ?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল—হাত-পা ঘামিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল—এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা, জাতে পতিত ব'লে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি ?

ঝরণার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল—এই গ্রামে সবাই হাঁ-হাঁ করবে—আমার জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল্ আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় 'সাঙা' ক'রে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল। মাড়োয়ারীবাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরী ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

ঝরণার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আমাকে রূপোর চুড়ি গড়িয়ে না দিলে তোর কোন কথা আমি শুনব না। আর আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে—তবে আমি যাব। নইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি! মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়! এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন। মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি—একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠিবে তোর হাতে! ছি!

ছেলেটি কথার কোন জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল—কি, রা কাড়িস না যি? কি বলছিস বল্? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি বলব বল্? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপোর চুড়িও দিতাম—বলতে হ'ত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল—তবে আমি চললাম।

—যা।

—আর যেন ডাকিস না!

—বেশ।

অল্প একটু দূর যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! হয়ত বিবাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে নয়ত গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে! বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার সেই রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে ত তাহার এককুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা—না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতেই হইবে। মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়,সখের সময়—আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপোর চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমা সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া উঠিয়া কুঁজীর মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল—বলি ওহে লাগর—শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল; পর মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্ত্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল ; ক্রুদ্ধা মার্জ্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল—মর মর ! তুই মর ! সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল ! পরমুহূর্ত্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল ! সর্ব্বনাশী ডাইনী বাউড়ীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরণার ধারে ; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে ; অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত ! তাহার পরই প্রবল জ্বর ; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে !

কিন্তু সে তাহার করিবে ?

কেন সে পলাইতে গেল ? পলাইয়া যাইবে ? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে ? সেই তাহার মত শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষ পর্য্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মত।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে—বলিয়াছে এই ছেলেটাকে ভাল করিয়া দিবে ! তাহাকেও দেখিয়া শহরের ডাক্তারে বলিয়াছিল—ভাল করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া সে মরিয়াছিল ! রোগ—ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, কাসি ! তবে রক্ত বমি করিয়াছিল কেন সে ?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মত। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসিত, কোনদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা !

হি হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ কি ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার ! দম যেন বন্ধ হইয়া গেল ! কি যন্ত্রণা ! উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জ্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে ! কর্—তোর যথাসাধ্য তুই কর্ !

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে ! তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল—তখন কি দুর্দ্দশাই না তাহার করিয়াছিল ! সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল ; কলের সেই হাড়ীদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে এক দিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে একধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল ! আবার যে কোথায় যাইবে !

ও কি ! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, স্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, তুমি ফিরে এস গো!

উঃ, তাহার নরুণ-দিয়া-চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দ্দান্ত ঘূর্ণি ঝড়! সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি!

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা কাঁটা ডালের স্থচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।

'বাণী মা'

আমার মেয়ে বাণী। পাঁচ পার হইয়া সবে সে ছয়ে পা দিয়াছে। হঠাৎ তাহার জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে পাকা গিন্নী হইয়া উঠিল। সংসারের সকলেই আমাকে সে জন্য দায়ী করিলেন—বলিলেন, বাপের আদরেই মেয়েটির মাথা খাওয়া গেল।

বিবরণটা এই। বাণীর আগে আমার আর একটি মেয়ে হইয়াছিল—কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম 'বুলবুল'। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও মধ্যে মধ্যে মনে হয়, অপূর্ব্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালবাসিতে পারে শোকের নির্ম্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি করিতে মানুষ পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মত হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তঃস্তলের শস্য এবং পানীয়ের অমৃত রসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, শোক বোধ করি সুখের চেয়েও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। শোক আস্বাদে অতি তীব্র কিন্তু অপূর্ব্ব, তাহার প্রভাব অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল হীনতার ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যায়। তাই শোক স্বল্পদিন স্থায়ী। মানুষ টানিয়া টানিয়া শোকাহতকে নীচে নামাইয়া আনে। প্রকৃতিও পরিহাস করিয়া তাহাকে নিম্নলোকে ঠেলিয়া দেয়। আমাকে যে অত্যন্ত সবলে শোকের রাজ্য হইতে টানিয়া নীচে নামাইল সে ওই বাণী।

বাণীর বয়স তখন সবে চার বৎসর। বুলুর অদর্শনে সে কাঁদিল কিন্তু আমার কান্না তাহার সহ্য হইল না—সে আমার কোলে আসিয়া চাপিয়া বসিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ ভরে ডাকিল, বাবা!

ডাকটি বড় মিষ্টি লাগিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিলাম—মা!

—আমার নাম কি, বাবা?

বুলবুলের নাম দিয়াছিলাম—বুল্‌বুল্‌-তুল্‌তুল্‌-ফুল্‌ফুল্‌-টুল্‌টুল্‌ ইত্যাদি।

ছড়াটা অনেক বড় ছিল কিন্তু বুলবুলের স্মৃতির সহিত সে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। বাণী অভিমান করিয়াছিল, সুতরাং তাহারও নাম রচনা করিতে হইয়াছিল। বাণী সেই নামের ছড়া শুনিতে চাহিল।

আমি বলিলাম, বাণী মা, রাণী মা, মণি মা, ধনি মা, চাঁদিমা-রাঙিমা, লালিমা-নীলিমা, মহিমা-গরিমা, সুরমা-সুষমা, মাসীমা-পিসীমা-মাগো-মা-মা-মা! সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম।

সে আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—কাঁদিস্‌ না, কাঁদিস্‌ না। যে মেরেছে তোকে, আমি মারব তাকে!

সেইদিন হইতে সে আমার মা হইয়া উঠিয়াছে।

সতীন শব্দের অর্থ সে নিশ্চয় জানে না—কিন্তু আমার মাকে বলে সতীন্‌। কথাটা আমিই শিখাইয়াছি। অর্থ না জানুক কিন্তু মা আমার মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত তাঁহার সন্তানের দাবী লইয়া ঝগড়া করেন—সেজন্য সে সতীনের মতই মায়ের উপর ঈর্ষা করে।

যদি জিজ্ঞাসা করি—বাণী মা, বাড়ীর মধ্যে দুষ্টু কে?

সে এদিক-ওদিক দেখিয়া চুপি চুপি বলে—ঠাক্‌মা।

যাক, এ ত সব খুঁটিনাটির কথা। সে ঈর্ষা তাহার দিন দিন বাড়িতেছে। সে ঈর্ষা বাড়িয়া এখন এতদূরে উঠিয়াছে যে, সে এখন সংসারের কর্ত্রীর পদ দাবী করিতেছে। ফ্রক সে পরে না, কাপড় পরা চাই, আঁচলে চাবী বাঁধা চাই, মাথায় অল্প ঘোমটা টানিয়া সে আমার মায়ের প্রত্যেক কর্ম্মটির অনুকরণ করে। বাহিরে কোন জিনিস পড়িয়া থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ সেটাকে টানিয়া এমন স্থানে রাখিয়া দেয়

যে খুঁজিয়া বাড়ীর লোক সারা হইয়া যায়। বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, আমি তুলে রেখে দিয়েছি! এমনি করে কি ফেলে রাখে! যদি কেউ নিয়ে যেত!

বলিয়া সে আরও কত কথা বলিতে বলিতে আপন খেলাঘরে গিয়া আপনার আঁচলের চাবী দিয়া ঘরের দরজা খোলে—কুটুস্-কুলুপ! তারপর সেটাকে বাহির করিয়া আনে। এই খেলাঘর যে তাহার কয়টা তাহার হিসাব কেহ জানে না। আর স্থান পরিবর্ত্তন তো অহরহ হইতেছে।

সেদিন বাড়ীর মেয়েদের নিমন্ত্রণ ছিল এক বিবাহবাড়ীতে। মা বলিলেন—বাবা, বউমা'র গহনার বাক্সটা যে বের ক'রে দিতে হবে।

বাহির করিয়া দিলাম। বাণী চীৎকার আরম্ভ করিল—আমার গয়না?

আমার মা নিজের নিরাভরণা মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন,—তুই যে বলিস তুই আমার সতীন—তোর বাপের মা—তুই গয়না পরবি কি? আমি গয়না পরেছি? আমার সতীন হ'য়ে গয়না পরবি কি তুই?

সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সতীন হব না।

অতঃপর গহনা বাহির না করিয়া দিয়া উপায় রহিল না।

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া দেখি—হুলুস্থুল কাণ্ড। বাণী কাতরভাবে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে—আর বাড়ীর সকলেই বলিতেছে—ওর বাপই আদর করে ওর মাথাটি খেলে!

ব্যাপার শুনিলাম, বাণীর মা বিবাহ-বাড়ী হইতে আসিয়া আপনার ও বাণীর গহনাগুলি খুলিয়া বাক্সতে বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। সেই গহনার বাক্স অকস্মাৎ এক সময় অন্তর্হিত হয়। বাড়ীর সমস্ত লোক যখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে—তখনই বাণী কোথা হইতে আসিয়া নিজের মাকে বলে—তোমার কাণ্ড বটে মা! এমনি করে গয়নার বাক্স নাকি—?

আর যায় কোথা—গহনা-শোক-বিহ্বলা বাণীর-মা আসিয়া তাহার পিঠে দুম্‌দাম্ শব্দে কিল-চড় বসাইয়া দিয়াছে। গহনার বাক্স অবশ্য পাওয়া গিয়াছে।

বাড়ীতে সমালোচনার আর অন্ত ছিল না—তখনও পর্য্যন্ত মেয়েটিকে কেহ স্নেহ-সম্ভাষণ করে নাই। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল—আমাকে দেখিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমার এ দৃশ্যটা অত্যন্ত নির্ম্মম বলিয়াই মনে হইল—আমি রাগ করিয়াই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

মা বলিলেন—আর আদর দিয়ো না বাবা, একটু শাসন করা দরকার।

ঘোমটার মধ্য হইতে বাণীর মা বলিলেন—ওই তো আদর দিয়ে মাথাটি খেলে!

আমি কোন কথা না বলিয়া বাণীকে বুকে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার বাড়ীতে ফিরিতেই মা বলিলেন—গহনার বাক্সটা যে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে বাবা!

আমার মনের ক্ষোভ তখনও মেটে নাই। আমি বলিলাম, আমি পারব না!

মাও এবার রাগ করিয়া উঠিলেন—না পার, নাই পারবে বাবা! যায় তোমাদেরই যাবে।

ঘরের ভিতর হইতে বাণীর মা বলিলেন, মেয়ে আর কারও হয় না, ছেলেপুলে আর কারও মরে না! সে তো আমারও সন্তান ছিল, না—একা ওরই ছিল!

উগ্র ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া বসিয়া রহিলাম—কোন উত্তর দিলাম না। বাণী এতক্ষণে শান্ত হইয়াছিল—সে আপন মনেই ঘুরিয়া খেলা করিতে লাগিল। বাণী শান্ত হইল—কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ীতে যে ঝটিকাবর্ত্ত উঠিয়াছিল তাহা শান্ত হইল না। শিশুতে এবং বয়স্কতে এইখানেই পার্থক্য! এমন কি, বাড়ীতে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত হইল না—রাগ করিয়া মা শুইতে চলিয়া গেলেন। একই বিছানায় নির্ব্বাক হইয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শুইয়া রহিলাম। বাণী কিছুতেই মায়ের দিকে শুইল না। আমার পাশে আসিয়া সে আবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঘটনার পরিণতিটা এতদূর আসিয়া যদি সমাপ্ত হইত তবে নিজেকে ভাগ্যবান

মনে করিতাম। নির্মম ভাগ্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিহাস করিবার জন্যই এমনি ক্রোধান্ধ করিয়া সমগ্র সংসারটিকে শোচনীয় পরিণামের পথে চালিত করিতেছিল। আমরা বুঝিতে পারি নাই।

সকালেই দেখা গেল, চোরে ঘরে সিঁধ কাটিয়াছে। মাটির ঘরেই কাপড়ের বাক্স-পেট্রা ছিল—সেগুলি তচনচ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! গহনার বাক্সও যে কাপড়ের বাক্সের উপরেই ছিল! গত রাত্রের অশান্তির তাড়নার ফলে তিনিও রাগ করিয়া বাক্সের উপরেই গয়নার বাক্স ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

মা বলিলেন—ওগো—আমার বুক যে কেমন করছে গো! ও মাগো!

আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া আমাকেই দোষ দিল। রাগ করিয়া এত টাকার গহনা বাহিরে রাখিয়া দেওয়া আমার উচিত হয় নাই, আর গহনা গহনা করিয়া এতটা গোলমালের পর। আবার এতটা চেঁচামেচি যদি না হইত তবে এমন হইত না। ঘরের লোকে—চাকর-বাকরেই কেহ না কেহ সন্ধান দিয়াছে। আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

মা বলিলেন—ওই মেয়েটি অত্যন্ত কুলক্ষণা! ওর থেকেই এই হ'ল।

পাড়াপ্রতিবেশীরা সায় দিল—একজন বলিল—ওরই দৃষ্টি-দোষে সে মেয়েটা গিয়াছে!

একজন বলিল—সে আর কি করবে বল! এখন পুলিশে খবর দাও।

—হ্যাঁ; মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইলাম।

—বাবা!

দারুণ দুর্দান্ত ক্রোধে আমার অন্তরটা সারা হইয়া উঠিল। সকল অনর্থের মূল ওই অলক্ষণা মেয়েটা আবার পিছন ডাকিতেছে! ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

বাণী পিছনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—গহনার বাক্স আমি রেখে দিয়েছি বাবা! মায়ের যে কাণ্ড—!

—কোথায়? কোথায়?

—সেই চান ঘরের পাশে চোরকুঠুরীতে আমার খেলাঘরে! কুলুপ দিয়ে—।

তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলাম—কই বের করে দেবে চল তো মা!

সে বলিল—সেই মা যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখুনই আমি দেখলাম। দেখে—বলি সামলিয়ে রেখে দিই!

খেলাঘরেই বাক্সটি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গেলাম—কিন্তু বাণী বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়াও কুলুপ খুলি!

বলিয়া সে শূন্যে চাবী ঘুরাইয়া মুখে শব্দ করিল—কুটুস্—কুলুপ—!

চোর

রাত্রির প্রথম প্রহরেই চুরি। 'ভাত-ঘুম' বলিয়া পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে ; ভাতই হউক আর রুটিই হউক আর মুড়িই হউক—আহার্য্যদ্রব্যে উদর পূর্ণ হইলেই বেশ একটা নেশার আমেজ জমিয়া আসে ; ভোরের ঘুমের মতই সে ঘুম উপভোগ্য। পল্লীবাসীরা সেই ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেই চুরি হইয়া যায়। উপর্য্যুপরি দশ-দশটা চুরি হইয়া গেল। পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ হইতে পুলিশ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

চোর যে একজন অথবা একই দল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সব ক্ষেত্রেই চুরি যায় বাসন ; তাও ঘটিবাটি নয়, কেবল থালা ; দামী কাপড়চোপড় কয়েক বাড়ীতে বাহিরে ছিল, সাধারণ কাপড়চোপড় তো সব বাড়ীতেই ছিল—সে সবে চোর কোন ক্ষেত্রেই হাত দেয় নাই! কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে যায় নাই, বাড়ীর দুয়ার যেমন বন্ধ— তেমনি বন্ধ থাকে, চোর পাঁচিল টপকাইয়া যায় আসে।

থানার দারোগা রামশরণ সিংহের যেমন একজোড়া প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড বড় গোঁফ—তেমনি তিনি রসিক ব্যক্তি—স্বীকারোক্তির জন্য আসামীর হাতের নখে আলপিন ফুটাইতে ফুটাইতে তিনি গান করিয়া থাকেন—

"পিরীতির বাবলা কাঁটা
বিঁধল পাঁজরে।
সখি লো—ব'লো নাগরে।"

সেই রামশরণ সিংহ দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—চোরের নাম তো পেলাম, এখন ঠিকানাটা পেলে হয় যে!

লোকজনে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল ; শার্লক হোম্‌সের মত রামশরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন—বেটার নাম টপকেশ্বর।

নাম ঠিক হইলেও ঠিকানা মিলিল না, দারোগা সাহেব এ চাকলার দাগীগুলার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তচনচ করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোনটিই টপকেশ্বরের গুহা বলিয়া নির্ণীত হইল না। অবশেষে তিনি চৌকিদারদের প্রহার দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামের বেকার যুবক সম্প্রদায়কে ডাকিয়া 'ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি' গঠন করিয়া—জোর পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহাতে ফল কিছু হইল, একটা মেছো মাছ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল, জমিদারের চাপরাশী গ্রামেরই একজন স্বৈরিণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে ধরা পড়িল, গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা কোন্দলকারিণী জাঁহাবাজ সুরভি ঠাকরুণ প্রতিবেশীর দরজায় ময়লা লেপিতে লেপিতে ধরা পড়িয়া গালিগালাজে নিশীথরাত্রি কদর্য্য করিয়া তুলিল। আরও অনেক কিছু হইল—কাহারা বাবুদের কাঁচামিঠে আমের গাছটা একেবারে ফাঁক করিয়া দিল, পানসিগারেট্‌ওয়ালা ফটিক দাসের দোকান হইতে পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট পূর্ণ দুইটা বাক্স চুরি গেল, গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় গোয়ালের গরুগুলি গোয়াল হইতে বাহির হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া ফিরিল, কিন্তু টপকেশ্বর ধরা পড়িল না, অথচ চুরিও বন্ধ হইল না। দশদিন, বিশদিন, কখনও একমাস, কখনও বা দুইমাস অন্তর এক একটা চুরি হইয়া চলিল। মোটকথা —'এই চুরি হইয়া গেল, এখন আর চুরি হইবে না' কিম্বা 'অনেক দিন হইয়া গেল —চোর এবার ভয় পাইয়াছে'—যে কোন ধারণায় মানুষ নিশ্চিন্ত হইলেই একদিন চুরি হইয়া যায়।

উপরওয়ালার গুঁতা খাইয়া রামশরণ দারোগার রসিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে বাড়িয়া গেল ; কথা কহিতে গেলেই লোকের সঙ্গে তিনি সহধর্ম্মিণীর সহোদর সম্বন্ধ পাতাইতে আরম্ভ করিলেন ; একজন চৌকিদারের নাকে গাড়ুর নল পুরিয়া নাসিকাগর্জ্জনের ঔষধ বাতলাইয়া দিলেন, এমন কি এই বয়সে পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করিবার আজীবনপোষিত সংকল্প স্ত্রীর সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন— স্ত্রীকে বলিলেন—শ্যালিকা !

ডিফেন্স পার্টি অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিলেন। অহরহ চিন্তায় চিন্তায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন।

এ গ্রামে চোর আছে—পাকাচোর, বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের রক্তে চৌর্য্যব্যাধির বীজাণু কিলবিল করিতেছে; সরকারী জেল-খানার দেওয়ালে পেরেক খোদাই দাগে—বাগানে রোপিত গাছের মধ্যে এ গ্রামের ডোমবংশের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ও গৌরবে জড়ানো আছে। কিন্তু বনিয়াদি বংশের মত তাহাদের ধারা-ধরণ তিনপুরুষ ধরিয়া একই চালে চলিয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহারা ধান-চোর। ধান চুরি করিতে আসিয়া হাতের কাছে অধিকতর মূল্যের জিনিস পড়িয়া থাকিতেও তাহারা তাহাতে হাত দেয় নাই। এ গ্রামের লোক আজ তিন পুরুষ ধরিয়া ধানের গোলাতেই মোটা এবং শক্ত তালা দিয়াছে, কিন্তু সিন্দুকের ভাবনা কোন দিন ভাবে নাই। তা ছাড়াও, ডোমবংশের কীর্ত্তি অব্যাহত রাখিতে পুলিশ এক শশী ছাড়া আর কাহাকেও বাহিরে রাখে নাই। বি-এল কেসে আঠারো বছর হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সকল ডোমেরই দীর্ঘ কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়া গেছে। একটা ছেলেকে তো ঠ্যাঙাইয়াই মারিয়া ফেলিয়াছে কুকুরের মত। এক আছে শশী—শশী অবশ্য এক কালের সিংহ—আফ্রিকার চতুর নরখাদক সিংহ, কিন্তু এখন সে স্থবির, বাতে প্রায় পঙ্গু। এক বৎসরেরও বেশী হইয়া গেল লাঠি ধরিয়া কোন মতে চলা-ফেরা করিতেছে। তাহার পূর্ব্বে মাস-ছয়েক শয্যাশায়ী হইয়াই ছিল। বসিয়া বসিয়া বাঁশ-তালপাতায় আপনাদের কাজ করিয়া এখন কায়-ক্লেশে বাঁচিয়া আছে। লোকটার যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। এই চুরির প্রথম ঝোঁকে ডোম পাড়া খানাতল্লাস করিতে গিয়া দারোগা স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন, শরীরের হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শশী একটা লাঠি পাশে রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া উবু হইয়া বসিয়া ছিল—তাঁহাকে দেখিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া নমস্কার করিয়াছিল।

একজন কনেষ্টবল ঘরের ভিতর হইতে জিনিসপত্র বাহির করিতেছিল, জিনিসের

মধ্যে রাজ্যের ডালা-কুলা। তিনি দাঁড়াইয়া শশীর দিকেই চাহিয়া ছিলেন, লোকটার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতেছিল। শশী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—শেষকালটায় বড় দুঃখ পেলাম হুজুর। আর বাঁচব না।

রামশরণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—তুই তো বড় পাজী রে বেটা শশে! তোর বাতব্যাধি আমাদের দিয়ে যাবার মতলব করছিস যে! এ্যাঁ? তুই বেটা ম'লে তো গোটা থানারই বাত ধ'রে যাবে রে ব'সে ব'সে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা সমঝাইয়া শশী ফিক করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল—লোক তো এসেছে হুজুর।

রামশরণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—তোর মাসতুত ভাইয়ের নামটা কি বল দেখি শশী? আমি তোকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস দেওয়াব সরকার থেকে। মাসতুত ভাই বলিতেই শশী আবার হাসিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—জানিনা হুজুর, বাতে ভুগছি—পক্ষাঘাত হবে মিছে বলি তো।

দারোগা তাহার মুখ চোখের দিকে চাহিয়া বুঝিয়াছিলেন—শশী মিথ্যা বলে নাই। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—শালা বড় জ্বালাতন করছে শশে। শালার টিকি দেখতে পেলাম না রে একদিন।

শশী মাসতুত ভ্রাতাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শ্যালক সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—শালার টাক আছে কিনা জানিনা হুজুর তবে ভাইয়ের আমার বুদ্ধিটা জবর বটে। আমাদের মতন ধানছড়া দিয়েও যায় না; দুম'ণে বস্তাও শালাকে বইতে হয় না।

রামশরণ চিন্তা করিতে করিতেও শিহরিয়া উঠেন, উঃ শশী যদি ধান চুরি না করিয়া অন্য চুরিতে হাত দিত তবে কি আর রক্ষা ছিল! এমন সুগঠিত দেহ—একেবারে তাজা কেউটে সাপের মত চেহারা—মিশ্‌কাল—ছিপ্‌ছিপে লম্বা! এককালে বেটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া ছুটিত। দেড়মণ ধান বোঝাই বস্তা লইয়াও শশী ছুটিলে পিছন হইতে কেহ কখনও তাহার গায়ে হাত দিতে পারে

নাই। আজও পর্য্যন্ত শশী কখন্ ধরা পড়ে নাই। শশীকে ধরিতে হইয়াছে তাহার বাড়ীতে আসিয়া। বেটা কেউটে যদি গর্ত্তে মুখ ঢুকাইত—অর্থাৎ সিঁদ দিতে শিখিত, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িত। সিঁদ দিবার মত এমন উপযোগী দেহ আর হয় না! কিন্তু ভগবান তাহাকে মারিয়াছেন। সাপটা মরিয়া গেছে—যেটা আছে সেটা তাহার খোলস।

রামশরণ ভাবিয়া কিনারা পান না। চোর নূতন, তাহাতে সন্দেহ নাই, নূতন কিন্তু পাকা। তিনি স্থানীয় বাজারটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন এবং রাত্রে সরীসৃপের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে সমস্ত রাত্রি সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। নগদ আট টাকা খরচ করিয়া ভদ্রলোক একেবারে প্রথম শ্রেণীর ক্রেপসোল জুতা কিনিলেন।

একদিন দেখা মিলিল।

রামশরণ সরীসৃপের মত তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিলেন—কিন্তু চোর যেন পাঁকাল মাছ, সে তাঁহার পাকের কবল হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

নাপিতপাড়ার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে নিতান্তই অকস্মাৎ নাপিতদের পাঁচিল হইতে একেবারে সম্মুখেই টপকেশ্বর ধপ করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রামশরণ লোকটাকে জাপটাইয়া ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য চতুর চোর, সে মুহূর্ত্তে বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে হনুমানের মতই বসিয়া বসিয়া একটা লাফ দিয়া—স্প্রিংয়ের পুতুলের মত উঠিয়া পলাইয়া গেল। সে ছোটা যেমন তেমন ছোটা নয়—জ্যা-বিমুক্ত তীরের মত তাহার গতি। রামশরণ পিছন ফিরিয়া চৌকিদারটার গালে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসাইয়া দিলেন—শালা, তুই করছিলি কি? লাঠি চালাতে পারলি না?

কৈফিয়ৎ ছিল; কিন্তু চৌকিদারটা দিতে সাহস করিল না; সঙ্কীর্ণ গলি, দারোগাবাবুর শরীর বিপুল—পাশ কাটাইয়া যাইবার পথ ছিল না। পিছন হইতে লাঠি মারিলে—

রামশরণ এতক্ষণে টর্চ্চ জ্বালিলেন—টর্চ্চের আলোয় বাঁ হাতটা একবার দেখিলেন—হাতখানা একবার চোরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল—এবং হাতে একটা চটচটে কিছু যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন। দেখিলেন—হাতময় তেল লাগিয়া গিয়াছে। তিনি আজ নিঃসন্দেহ হইলেন—টপকেশ্বর বিদেশ হইতে ছুটকাইয়া আসিয়াছে। লোকটা সিঁদেল চোর, দেহ তৈলাক্ত করিয়া যাওয়ার পদ্ধতিটাই সিঁদেল চোরের; সিঁদের মধ্যে পা পুরিলে কেহ যদি পা চাপিয়া ধরে তবে টানিয়া লইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সদুপায় আর কিছু হইতে পারে না। আরও বুঝিলেন—সঙ্গের অভাবেই সহধর্ম্মিণীর সহোদর সিঁদ না দিয়া বাসন চুরি করিয়া ফিরিতেছে। গোল লাগিল এক জায়গায়, সাপ বাঘের শক্তি পাইল কি করিয়া? সিঁদেল চোরের বিবর লইয়া কারবার—সে এমন লাফ দেয় কেমন করিয়া?

ইহার পরদিন হইতে চুরি বন্ধ হইয়া গেল। পুরা একমাস বন্ধ থাকিয়া আবার একদিন চুরি হইল; এবার চুরি ভোর রাত্রে। শম্ভু ঘোষ হলপ করিয়া বলিল—রাত্রি তিনটার সময় সে বাহিরে উঠিয়াছিল, তখনও রান্নাঘরের তালা অটুট ছিল।

কটমট শব্দে রামশরণ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন—রাত্রি তিনটে! ওরে, শেয়াল ক'বার ডেকেছিল?

শম্ভু হাঁ করিয়া রহিল।

রামশরণ বলিলেন—রাত্রি ক'পহর হয়েছিল রে বেটা তাই বল্। শেয়াল ডাকা না শুনে থাকিস, ভুক্কো তারা উঠেছিল কি না বল্। রাত্রি তিনটে! রাত্রি তিনটে! বেটার চালে যেন টাওয়ার ক্লক বাজে! রাত্রি তিনটে!

শম্ভু সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে আমার ঘড়ি আছে।

রামশরণ অপ্রস্তুত হইয়া আরও চটিয়া উঠিলেন—বলিলেন—বাজে? না, বাজে না?

—বাজে। আমি ফিরে এসে শুনলাম আর তিনটে বাজল।

—হুঁ! আচ্ছা যা, বাড়ী যা।

ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী হইল। দারোগা রামশরণ আবার ডাকিলেন—শোন্।

—বাড়ীতে কলাগাছ আছে ?

—আজ্ঞে আছে।

—তবে বাসনগুলো সিন্দুকে পুরে, কলাপাতা কেটে ভাত খাবি। আর জল খাবি নারকেল মালায়—বুঝলি ?

ঘোষ সবিনয়ে 'যথা আজ্ঞা' জানাইয়া প্রস্থান করিল। ক্রোধে লজ্জায় ক্ষোভে রামশরণের চোখে জল আসিল। সাঁতরাগাছির ওলের মত পুলিশ-সাহেবের চাঁচাছোলা রক্তরাঙা মুখখানি মনে পড়িয়া মনে হইল—মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডস মারিয়া আত্মহত্যা করেন !

দশদিন চোরের একদিন সাধুর—এ-কথাটার আধ্যাত্মিক সত্যতা অস্বীকার করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যতা না মানিয়া উপায় নাই। বিবরে বাস করিয়া, জনহীন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে সাপ ঘোরে সেই সাপও একদিন মানুষের সম্মুখে পড়িয়া যায়।

চোরকেও একদিন গৃহস্থের সম্মুখে পড়িতে হইল।

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর কাস্তের মত চাঁদ সবে পূর্ব্বদিগন্তে উঠিয়াছে, দিগন্তপ্রান্তের শারদ জ্যোৎস্না নির্ম্মল আকাশপটের প্রতিফলনে অন্ধকারকে অতিমাত্রায় স্বচ্ছ তরল করিয়া তুলিয়াছিল। অমৃত ঘোষাল দরজা খুলিয়া বাহির হইয়াই দেখিল—একটা লোক বসিয়া গামছায় বাসন বাঁধিতেছে। ঘোষাল লোকটা গোঁয়ার এবং বুদ্ধিমান—দুই-ই। একবার ভাবিল—ঝাঁপ দিয়া লোকটার উপর লাফাইয়া পড়ে, পরক্ষণেই মনে হইল যদি লোকটার কাছে অস্ত্র শস্ত্র কিছু থাকে! দ্বন্দ্বটা মুহূর্ত্তের, কিন্তু সেই অবকাশেই টপকেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল—পর মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গিয়া পাঁচিলের উপর একটা হাত দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে পাঁচিলের উপরে উঠিয়া বসিল; তাহার পর আর নাই।

ঘোষাল 'চোর-চোর' চীৎকার করিতে করিতে দরজা খুলিয়া ছুটিল। চোরকে সে চিনিয়াছে। চোর শশী! শ'শে ডোম! শ'শে চোর!

শশীর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু শিকলটা মৃদু মৃদু দুলিতেছে। মুখুজ্জে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল, দরজায় লাথির উপর লাথি মারিয়া সে ডাকিল—হারামজাদা শালা!

নামটা পর্য্যন্ত সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

শশী ঘরের মধ্যে রোগযন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। সবিনয়ে সকাতরে সে উত্তর দিল—আজ্ঞে—কে মশায়?

ঘোষালকে আর পরিচয় মুখে দিতে হইল না, এবারকার প্রচণ্ড পদাঘাতে জীর্ণ কুটীরের দরজার খিল ভাঙিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল—ঘোষাল শশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—আমি।

খোলস নয়, কালোসাপ ফণা তুলিয়া বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সক্ষম শশী একেবারে ঘোষালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

খপ করিয়া শশীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ঘোষাল অপর হাতটা তাহার বুকের উপর রাখিল। মুখুজ্জের হাতে কি লাগিয়া গেল—কিন্তু সে অনুভব করিল—শশীর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিতেছে! ঘোষাল বলিল—শালা চোর!

শশী বলিল—ঠাকুর, বাড়ী যাও, তোমার বাড়ীতে আর চুরি হবে না। আমি দিব্যি করছি।

একটু দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল, ঘোষালের ডাকে লোক উঠিয়া এই দিকেই আসিতেছে। রামশরণ দারোগার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা গেল—ওরে শালা, গায়ে কাদা মেখে যমকে ফাঁকি দেবার মতলব! শালার বুকে চ'ড়ে আজ হাঁটব আমি, কাদা বানাব শালাকে। কীচকবধ করব আজ!

সাহস পাইয়া অমৃত এবার শিখণ্ডী বিক্রমে আস্ফালন করিয়া উঠিল—একটা

অতি অশ্লীল গাল দিয়া—কি বলিতে গেল ; কিন্তু গালটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র সজোর আকর্ষণে হাতখানাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শশী মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিল। ঘোষাল প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল ; চোখের সম্মুখে ছায়াবাজির মত কাল দীর্ঘ কি-একটা ধূসর আবছায়ার মধ্যে মিলাইয়া গেল, কানে আসিল লঘু দ্রুত একটা ক্রমবিলীয়মান শব্দ।

লোকজন এবং দারোগা যখন আসিয়া পৌছিল তখন অমৃত আত্মস্থ হইয়াছে, কিন্তু শশী নাই।

রামশরণের তাণ্ডবনৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া কয়জন চৌকিদার, দফাদার ও কনষ্টেবলকে ছুটাইয়া দিলেন! জনতার সকলেই প্রায় শেষরাত্রির রহস্যঘন আবছায়ার দিকে চাহিয়া শশীকে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রত্যেকেরই চোখের সম্মুখে আবছায়া যেখানে ঘন হইয়া উঠিয়াছে সেইখানে দীর্ঘ কালো একটি মূর্তি যেন নাচিতেছিল! সকলেই বলে—ওই! নয়?

রামশরণ সহসা গম্ভীর মুখে অমৃতের কাছে আসিয়া বলিলেন—এই বেটা বাম্না—ঘরের দরজা ভেঙ্গে পালোয়ানী করতে গেলি কেন? শেকল দিলি না কেন?

ঘোষাল একটু ভয় পাইয়া গেল, সে গালে হাত বুলাইয়া বলিল—আমার দুর্মতি ছাড়া কি বলব, বলুন?

—হুঁ। কোন্ গালে চড় মেরেছে দেখি?

ঘোষাল লজ্জিতভাবেই দেখাইল—বাম গালটি দারোগার দিকে ফিরাইয়া বলিল—বেকায়দায়—আর আমি বুঝতে পারি নাই ঠিক।

রামশরণ টর্চ্চ জ্বালিলেন—দেখিলেন পাঁচটি সোঁটা-সোঁটা দাগ একেবারে রক্ত-মুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকদের সকলেই বলিয়া উঠিল—এঃ!

একজন বলিল—সাঙ্ঘাতিক চড় মেরেছে রে বাবা!

রামশরণ অত্যন্ত খুশী হইলেন—ঘোষালের মুখের কাছে অত্যন্ত বিনয়-সহকারে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—বে—শ করেছে! তাঁহার ইচ্ছা ছিল—শশী এক চড়

মারিয়া গিয়াছে বাম গালে—তিনিও একখানি চড় কষাইয়া দেন উহার ডান গালে। কিন্তু আইন বড় কড়া।

হাতের মাছ জলে চলিয়া গেল, হাতের আসামীকে ফেরার করিয়া দিল!

শশী সত্য সত্যই ফেরার হইল।

কিন্তু জীর্ণ শশী এই রোমাঞ্চকর চৌর্য্যপর্ব্বের ক্ষিপ্র সুকৌশলী নায়ক, বাতরোগে পঙ্গুপ্রায় শশীই সেই টপকেশ্বর, এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গ্রামের লোক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। রামশরণ বলিলেন—হারামজাদা বেটার রক্তের দোষ, নইলে চুরি করতে গেল কেন? যাত্রা থিয়েটারে এ্যাক্টো করলে ও বেটার ভাত খায় কে? উঃ কি রকম বেতো-রোগী সেজে ব'সে থাকত বল দেখি। আগাগোড়া বেটার বজ্জাতি!

রামশরণের খানিকটা ভুল হইল, 'আগ' অর্থাৎ শেষের দিকটা বজ্জাতি—কিন্তু গোড়াটা নয়। গোড়ায় তাহার সত্যই রোগ হইয়াছিল, সে-রোগ যেমন-তেমন নয়, তাহাকে একেবারে পঙ্গু শয্যাশায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। আর সে কি তীক্ষ্ণ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। শশীর ছেলে হাবল তখন বাড়ীতে। রোগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শশী নিজেই ছিল ডোম দলের সিংহ; তখন তাহার বাড়ীতে চালচলন প্রায় সামন্ত-তান্ত্রিক আমলের ছোটখাট বর্ব্বর সামন্তপতির মত! স্ত্রী ছাড়া সেবা করিবার জন্য আরও দুইটি স্ত্রীলোক শশীর ছিল। জোয়ান ছেলে হাবলের ছিল স্ত্রীর উপর একটা। শশী পাকি-মদ ছাড়া খাইত না। ছাগল ভেড়ার পাইকার ইছু সেখের আনাগোনার বিরাম ছিল না। সপ্তাহে দুই-তিনটি বৃহদাকার খাসী সে শশীর বাড়ীতে বাঁধিয়া দিয়া যাইত। নবীন স্বর্ণকার রূপার চুড়ি, সোনার নাকছাবী, কানের টপ তৈয়ারী করিয়াই দিন চালাইত। ডোম কন্যারা আজ কিনিয়া দশদিন পর আধা দামে বন্ধক দিত—অথবা বিক্রয় করিত। আবার বিশ দিন পর নূতন কিনিত।

এই সময়েই শশী রোগে পড়িল। শশী একটা ডুলি ভাড়া করিয়া ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন হইল, শুধু ডুলি নয়—সঙ্গে সঙ্গে একখানা ভাড়ার গাড়ী—গাড়ীতে গেল—স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূ ও হাবল।

সপ্তাহখানেক না যাইতেই শশী অস্থির হইয়া উঠিল, হাবলকে ডাকিয়া দাঁত কিষ কিষ করিয়া বলিল—আমাকে মেরে ফেলবি নাকি—তুই মনে করেছিস কি?

হাবল বলিল—অই—তুমি বলছ কি? রোগ কি তোমার আমি ক'রে দিয়েছি নাকি?

ভীষণ ক্রোধে শশী চীৎকার করিয়া উঠিল—হারামজাদা শালা—কাটা গাছের মত আমি প'ড়ে থাকব কতদিন শুনি?

হাবল শশীকে ভয় করিত, বাপ বলিয়া নয়—বনের পশুতে যে হিসাবে বাঘকে ভয় করে—সেই হিসাবে ভয় করিত; একা হাবল নয়—এই ডোমপাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করিত। হাবল এবার মিষ্ট করিয়া বলিল—তা আমি কি করব বল?

—ডাক্তার নিয়ে আয়—হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে। ফুঁড়ে ওষুধ দিক। এমন শুয়ে থাকতে আমি পারছি না।·····শালার ধর্ম্মরাজ—! অকস্মাৎ সে ধর্ম্মরাজকে গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সত্যই—এ অবস্থা শশীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে হাবল যখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে উঠান পার হইয়া বাহির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায়—শশী তখন অস্থির হইয়া উঠে; মুখে লাথি মারিয়া সে-দিন সে একটা সেবাদাসীর সামনের দুইটা দাঁতই ভাঙ্গিয়া দিল। মেয়েটা সেই রাত্রেই পলাইয়া গেল। পাড়ায় সন্ধ্যায় যখন গান বাজনার আসর বসে—তখন শশী গালিগালাজে বাড়ীটাকে কদর্য্য করিয়া তোলে; কিন্তু বাড়ীটা নির্জ্জন—শুনিবার কেহ নাই, শশী আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠে। স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, সেবাদাসী—সব চলিয়া যায়; গান বাজনার মাতনে মাতিয়া কেহ হা-হা করিয়া হাসে—কেহ গান গায়, কেহ নাচে। কেবল ঘরের পাশেই শশীর বিধবা

ভ্রাতৃবধূ গুন গুন করিয়া কাঁদে তাহার মৃত পুত্র ফিঙের জন্ত! ফিঙেকে ঠ্যাঙাইয়া মারিয়াছে কৃপণ চৌধুরী। চৌধুরীর গোলাটি ফাঁক করিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রতিশোধ হয় নাই! শশী নিষ্ফল আক্রোশে চুল ধরিয়া টানে! শশী একদিন চেষ্টা করিল ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে। না পারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিল। এমনি অস্থিরতার মধ্যে শশী ধর্ম্মরাজকে গালিগালাজ করিয়া হাবলকে ডাক্তার আনিতে হুকুম করিল। হাবল ডাক্তারই লইয়া আসিল। ডাক্তার ইনজেকসন দিতে আরম্ভ করিলেন। শশী মিনতি করিয়া বলিল—ভাল ক'রে দেন আমাকে ডাক্তার-বাবু, আমি আপনাকে একটা সোনার 'আঙ্গুটি' গড়িয়ে দোব।

ডাক্তার হাসিলেন।

ঠিক এই সময়েই আরম্ভ হইয়া গেল—বি-এল কেস।

আসামীদের মধ্যে শশীও ছিল—এবং সেইই ছিল প্রধান আসামী। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসেই বিচার হইতেছিল। পঙ্গুপ্রায় শশী একখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইত, সেখানে হাবল এবং আর একজন তাহাকে জড় একখানা প্রস্তর-খণ্ডের মতই ধরাধরি করিয়া একস্থানে বসাইয়া দিত। এইখানেই তাহার ভাণ-শিক্ষার হাতে খড়ি। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে সত্যকার অবস্থার অপেক্ষাও অনেক বেশী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত। নাকের ডগায় মাছি বসিলেও সে হাত নাড়িত না, চোখের তারা দুইটাকে নাকের পাশে আনিয়া মাছিটার পাখার কম্পন ও পা-নাড়া দেখিত, হঠাৎ বিরক্ত হইয়া মনে মনে মাছিটাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া মাথা নাড়িয়া সেটাকে তাড়াইত।

ইহাতেই সে খালাসও পাইয়া গেল। হাকিম যথেষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অবস্থা দেখিয়া জেলে পাঠাইলেন না; শশী ডাক্তারকে সাক্ষী মানিয়াছিল—তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া হাকিম তাহাকে রেহাই দিলেন। ডাক্তার সত্য কথাই বলিয়াছিল—সে শশীর চিকিৎসা করিতেছে, দুরন্ত বাত ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। এ রোগ না সারিতেও পারে—সারিলেও অচিরে সারিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধই তাহার যথেষ্ট শাস্তি বিবেচনায় তাহাকে বাদ দিয়া হাকিম অপর সকলের উপর দীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কোর্ট-রুমের বাহিরে আসিয়াই শশী কদর্য্য ভাষায় ডাক্তারকে গালিগালাজ আরম্ভ করিল; শালা খুনে মানষ্যরো জোচ্চোর! ভাল হবে না তো ফাঁকি দিয়ে টাকা নিলি কেনে আমার, প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে ফুঁড়ে ফুঁড়ে আমাকে মারলি কেনে? ছোট ছেলের মত সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছেলে ভাইপো ভাগ্নে জামাই—সবাই চলিয়া যাইবে; সে এই অক্ষম পঙ্গু দেহ লইয়া না খাইয়া শুকাইয়া মরিবে, স্ত্রী-কন্যা সকলকে শুকাইয়া মারিবে, বধূরা পলাইয়া গিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে, সব দেখিতে হইবে। মালসা-মালদারেরা একটি পয়সা দূরে থাক একমুঠা চাল দিয়াও সাহায্য করিবে না। অন্তত, ডাক্তার যে কথা আজ আদালতে হলপ করিয়া বলিয়াছে—তাহার পর ইহা নিশ্চিত। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না, আক্রোশে আক্ষেপে দুর্দ্দান্তভাবে আপনার বুক চাপড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল; হাত সে নাড়িতে পারে—কিন্তু হাত নাড়িতে তাহার সাহস হইল না। চারিদিকে লোক। দুইজন কনেষ্টবল অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। মোটর গাড়ীর পা-দানে পা রাখিয়া হাকিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টবাবুর সহিত কথা বলিতেছেন।

ডোমেরা আপীল করিল। কিন্তু ফলে দুই-চারি মাস করিয়া দণ্ড-লাঘব ছাড়া অন্য কোন কিছু হইল না। খালাস কেহ পাইল না।

সেদিন ডোমেদের আত্মসমর্পণের দিন! সদরে গিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত পাড়া জুড়িয়া কান্নার রোল উঠিল। কনেষ্টবল দারোগা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এত দুর্দ্দশার মধ্যেও গত রাত্রে খাসী কাটিয়া মাংস রান্না হইয়াছিল। বিদায়-ভোজ জাতীয় ব্যাপার। ইংরেজী

ফ্যাশানের অনুকরণে নয়—তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। বাসি মাংস ও ভাত খাইয়া—পান মুখে দিয়া ডোমেরা ম্লানমুখে চলিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে গেল। ষ্টেশনে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিবে। পথে বাহির হইয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কান্না বন্ধ করিল। এখন তাহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। ফিরিবে তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। এই নিয়ম। জনশূন্য ডোম-পল্লীতে পড়িয়া রহিল শুধু দুটি পুরুষ। শশী আর শশীর দাদা অভিলাষ। শশী পঙ্গু—অভিলাষ অন্ধ।

শশী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। অকস্মাৎ সে মাথা তুলিয়া দেখিল—সকলে চলিয়া গিয়াছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—কিছুই দেখা গেল না—ঘাড় উঁচু করিয়াও পাচিলের ওপার নজর হয় না। সম্মুখস্থ খুঁটিটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া একটু উঁচু হইতে সে চেষ্টা করিল। এবার মাথাগুলা দেখা যায়। আরও একটু ভর দিয়া—আর একটু—আরও একটু—হ্যাঁ, এইবার সকলকে দেখা যাইতেছে। সারি সারি সব চলিয়াছে—ওই যে হাবল! নূতন পুকুরের উঁচু পাড়ের আড়ালে দলটা অদৃশ্য হইয়া গেল; শশী এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া—আনন্দে উল্লাসে একটা উৎকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাষাহীন আদিম মানুষের উল্লাসধ্বনির মত সে ধ্বনি বর্ব্বর, উচ্চ ও অকপট!

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! কিন্তু পরক্ষণেই সচকিত হইয়া সে বসিয়া পড়িল! কে কোথায় মানুষ আছে, কে জানে!

সে-দিন সমস্ত দিন ধরিয়া শশী গভীর ভাবনা ভাবিল। শুধু নিজের ভাবনা নয়, স্ত্রী-কন্যা আত্মীয়া বালক শিশু—সমগ্র ডোম পাড়ার মেয়ে ও ছেলেদের ভাবনা সে ভাবিল। গণিয়া হিসাব করিয়া সে দেখিল—সর্ব্বসমেত চৌদ্দটি মেয়ে, ছয়টি ছেলে। দুইটা ছেলে বেশ ডাঁটো হইয়া উঠিয়াছে, রাখালী করিয়া নিজের ভাতকাপড় তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে—উপরন্তু সংসারে কিছু দিতে পারিবে। এ ছাড়া

রাত্রে বাহির হইবার যোগ্যতা তাহাদের না হইলেও দিনের সুযোগে এবং সন্ধ্যাতেই আঁচল ভরিয়া ধান চাল—তরি-তরকারি আনিবে।

পরক্ষণেই সে শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল—আজিকার প্রাতঃকালে ডোম জোয়ানদের সেই শোভাযাত্রা—মনে পড়িল সমগ্র পাড়াটার অসহায় অবস্থা। মনে পড়িল ফিঙের মৃত্যু! না—আর চুরি নয়, চুরি আর সে কাহাকেও করিতে দিবে না। হাত দুইটা সঞ্চালন করিয়া সে দেখিল—সে পারিবে, ডোম-কাটারি লইয়া বাঁশের তালপাতার কাজ সে বেশ করিতে পারিবে। মেয়েগুলা তালপাতার চাটাই বুনিবে, পাতার শির দিয়া ঝাঁটা বাঁধিবে, বাঁশের ছিলকা দিয়া পাখা, ডালা, কুলা, সাজি তৈয়ারী করিবে—সে নিজে মোড়া তৈয়ারী করিবে, থল্‌পা বুনিবে। এছাড়া আর উপায় নাই—যুবতী কন্যা বধূগুলি অভাবের অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে বাঁধ-ভাঙ্গা জলের মত অধীর মুক্তি দিয়া যাহা করিয়া বসিবে সে কল্পনা করিয়া রুগ্‌ণ শশীর শীতল রক্ত যেন জমিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার মনে পড়িল—সে যেবার প্রথম জেলে যায়—সেবারও এমনি পাড়াসুদ্ধ পুরুষের জেল হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছিল—তাহার ছোট বোনটা ঝুমুরের দলে পলাইয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম পক্ষের কিশোরী বধূটা গ্রামান্তরে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে। পাড়ার তিনটা মেয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বাকী মেয়েগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগিতেছে।

শশীর বর্ত্তমান স্ত্রী একটু হাবা গোছের, চিন্তান্বিত শশীকে দেখিয়া সে বলিল—ঘুম আইচে না কি গো?

শশী বলিল—হাঁ।

হাবলের সেবাদাসীটা আজ ষ্টেশন হইতেই ভাগিয়াছে, সে আর ফেরে নাই। শশী ঠিক করিল—তাহার সেবাদাসীটাকে সে কাল খেদাইয়া দিবে। পরক্ষণেই মনে হইল—না, মেয়েটা তালগাছ চড়িতে পারে, তাহার উপর কর্ম্মঠ, ডোমের কাজ সে ভালই জানে। তাড়াইতে হইলে ওই হাবা স্ত্রীটাকেই তাড়াইতে হয়।

কিন্তু সে হাবলের মা, সরলার মা; তাহার উপর শশীর অনুপস্থিতিতে হাজার অভাবেও সে অন্যায় কিছু করে নাই। আর যতবার শশীর জেল হইয়াছে—ততবার সে যে বুক-কাটা কান্না কাঁদিয়াছে, সে শশীর বুকে যেন গাঁথা হইয়া আছে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, পাড়াটা আজ নিস্তব্ধ। মনে হয় যেন গভীর রাত্রি। শশী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল—অকারণে।

শশীর স্ত্রী আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—অই—অই—তুমি উঠে দাঁড়াইচ লাগছে! ওলো সরলা।

কেউ ডাকিলে বাঘ যেমন ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করে, শশীও ঠিক তেমনিভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—অ্যা—ও!

শশীর স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া গেল, শশী বলিল—একটি একটি করিয়া, দৃঢ় কঠিন স্বরে—টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে দোব কাউকে বলবি তো।

সমস্ত বাড়ীটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শশী আবার বলিল—পুলিশ জানতে পারলে আমাকে স্বদ্ধ জেলে পাঠাবে আবার।

ধীরে ধীরে সে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পাড়াতে সেই ব্যবস্থাই শশী প্রবর্ত্তিত করিল—কঠোর দৃঢ়তার সহিত—বর্ব্বর জাতির রাজার মত। বলিল—আমার তো মরণদশাই হয়েছে, খুন ক'রে না হয় ফাঁসিই যাব!

অন্ধ অভিলাষও আসিয়াছিল, সেও শশীকে সমর্থন করিল—বৃদ্ধ অপারগ মন্ত্রীর মত। অন্য সকলেও সদ্য-আপনজন-বিচ্ছেদে আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই একথা মানিয়া লইল।

ডোম-পাড়ায় উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস-বিলাসের পরিবর্ত্তে একটা কর্ম্মপ্রবণতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। একদিন দারোগা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন—

তুই বেটার নাম পাল্টে দিলাম রে শশী। ঋষি বলে ডাকব তোকে—তুই বেটা ঋষি বনে গেছিস।

শশী কৃতজ্ঞ হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া প্রণাম করিবার জন্য উঠিল। দারোগা বলিলেন—দাঁড়াতে পেরেছিস?

শশীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে লাঠিটা টানিয়া লইয়া ভর দিয়া অতি কষ্টে দুই পা হাঁটিয়া দারোগাকে প্রণাম করিয়াই কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে সে সত্য সত্যই কাঁপিতেছিল। দারোগা বলিলেন—একটু একটু ক'রে অভ্যেস করিস হাঁটা—নইলে পা জমে যাবে।

দারোগা নিজে একটা সাজি, একটা মোড়া এবং খানকয়েক পাখা কিনিয়া লইয়া গেলেন।

শশী উঠিয়া বিনা লাঠিতেই ধীরে ধীরে দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া সে লাঠি হাতে পাড়ায় বাহির হইল। কিন্তু যন্ত্রণায় মুখ মুহুর্মুহু বিকৃত হইতেছিল। সে তাহার ভাল। পাড়ায় গাছটার ছায়ায় বসিয়া মেয়েগুলি ক্ষিপ্র হাতে বাঁশ তালপাতা লইয়া কাজ করিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু সে কয়দিন?

মাস তিনেক পরেই একদিন সে শুনিল—একটা টেরিকাটা ছোঁড়া শিষ দিতে দিতে পাড়ায় যাওয়া-আসা করিতেছে। সে কতকগুলা ঢেলা সংগ্রহ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইতেই শশী সতর্ক ছিল—শিষের শব্দ শুনিয়া শব্দভেদী বাণের মত এমন ঢেলা ছুঁড়িল যে শিষ বন্ধ হইয়া গেল।

শশী চীৎকার করিয়া হাঁকিয়া বলিল—কাস্তেতে ক'রে শালার জিভ কেটে লোব। শিষ দেবে আমার পাড়ায়!

শিষ বন্ধ হইল, কিন্তু দূর হইতে সিটি বাঁশী বাজা শুরু হইল। শশী খোঁজ করিয়া দেখিল—পাড়ার কাজ অর্দ্ধেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া

দেখিল—মেয়েগুলার পরনে বাহারে-পাড় মিলের শাড়ী। সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—এই দেখ, খুন ক'রে ফেলাব আমি।

শশীর ভাইঝি—অভিলাষের কন্যা সুরধুনী মুখরা মেয়ে, আবার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে মুখের উপর জবাব দিল—ভাত কাপড় দিবি তু? আমি উ খাটুনি খাটতে লারব। বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইল। শশীর ইচ্ছা হইল সেও ছুটিয়া গিয়া হারামজাদীকে ধরিয়া টুঁটিটা টিপিয়া ধরে; কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। দিন তিনেক পরেই শশী সকালে উঠিয়া শুনিল—সুরধুনী গত রাত্রে পলাইয়াছে। এখানকার ধান-কলের ছোকরা মিস্ত্রি তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শশী আপনার উঠানে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্থির পশুর মত ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তাহার কন্যা সরলাও ছিম-ছাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাবলের বউটা বাপের বাড়ী গিয়া আর কিছুতেই আসিতেছে না। পদচারণার অস্থিরতা তাহার বাড়িয়া গেল। আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল। অভিলাষের বউ কাঁদিতেছে, সুরধুনীর দৌলতেই তাহাদের ভাত-কাপড় জুটিতেছিল। শশীর দৌরাত্ম্যেই সে দেশছাড়া হইয়াছে।

অপরাহ্নে শশী বাড়ীর সম্মুখে গাছতলায় বসিয়াছিল, দেখিল স্ত্রীর হাত ধরিয়া অভিলাষ চলিয়াছে; অভিলাষের স্ত্রীর হাতে একটি ছোট ডালা! সে চমকিয়া উঠিল—বলিল—কোথা চল্লি দাদা?

অভিলাষ উত্তর দিল না।

শশী আবার ডাকিল—দাদা!

অভিলাষ তবু উত্তর দিল না।

সক্রোধে শশী বলিল—ওরে শালা কানা, বলি কালাও হয়েছিস না কি?

অভিলাষও গর্জ্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—কি বললি হারামজাদা?

—বলি, চললি কোথা?

—মরতে। ভিখ করতে চললাম।

—ভিখ করতে? বেনো ডোমের ছেলে হ'য়ে তোর মরণ নাই—কানা ভেড়া—

অভিলাষের অন্ধচক্ষুও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু দিবি আমাকে খেতে?

—দোব। ফিরে আয়।

তৎক্ষণাৎ সে দৃঢ়পদে বাড়ী ঢুকিয়া আপন সম্বল হইতে একটা সিকি আনিয়া তাহাকে দিয়া বলিল—দু আনা ক'রে পয়সা তোকে আমি রোজ দোব। খবরদার, বাড়ী থেকে পা বার করবি না।

অভিলাষ ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহার বউ আপত্তি করিল—তোর ভিখ লোব কেনে?

শশী একটা আঙুল দেখাইয়া বলিল—বাড়ী যা!

অভিলাষের বউ আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

রাত্রেও সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

সহসা তাহার মনে হইল তাহারই বাড়ীর পিছনে কে ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছে। মনটা তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—বিদ্যুৎরেখার মত মনে একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল—ছিম-ছাম সরলার ছবি। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিল—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল কে একটা লোক উপরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিল—উপরের জানালায় কথা বলিতেছে সরলা। সে একটা ঢেলা তুলিয়া সজোরে ছুঁড়িল লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া—ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বোঁ শব্দ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। লোকটা ছুটিয়া পলাইল—ক্রোধে আত্মহারা শশী আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—সেও ছুটিল। কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করিল—অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একটা বিপুল উল্লাস অনুভব করিল। আকাশ-

পাতাল জোড়া নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটিয়াছে ; বুকটা ধড় ধড় করিতেছে, যেন ফাটিয়া যাইবে—তবুও এ কি উল্লাস। হাউইয়ের অগ্নিবর্ষী উল্লাসের সঙ্গেই তাহার এ উল্লাস তুলনীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া সে নিঃশব্দ সঞ্চরণে গ্রামের গলি পথ ধরিয়া চলিল। গলিপথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাহার প্রবৃত্তি যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল। এক জায়গায় সে থমকিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরীর বাড়ী। উঠানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা। চৌধুরী ফিঙেকে হত্যা করিয়াছে! শক্তির দম্ভ করে সে! সে হাত তুলিয়া পাঁচিলের মাথা ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল ; মুহূর্ত্তে সে উপরে উঠিল। আপন শক্তিতে আপনিই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সন্তর্পণে নীচে লাফ দিয়া পড়িয়াই তাহার মনে হইল সে করিয়াছে কি ? ধান সে লইবে কি করিয়া ? বস্তা তো আনে নাই! সেই মুহূর্ত্তেই উচ্ছিষ্টভোজী বিড়ালটার পায়ের চাপে বাসনের শব্দ উঠিল—ঠুং-ঠাং।

শশী বিস্ফারিত নেত্রে বাসনগুলার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে অনেক কথা মাথার ভিতরে হু হু করিয়া খেলিয়া গেল। ধানের বোঝা অনেক ভারী! হাজার সুস্থ হইলেও পূর্ব্ব শক্তি তাহার আর নাই! অল্প বাসনে দাম বেশী হইবে! ধান চুরিতে সঙ্গীর প্রয়োজন—বাসন একাই চলিবে।

সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল—আলনা হইতে একখানা গামছা টানিয়া বাসনগুলি বাঁধিয়া—সে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। দুয়ারটা খুলিতে গিয়া দেখিল—দুয়ারে তালা। চৌধুরী ঘুঘু হুঁশিয়ার লোক! সে হাসিল। পরক্ষণেই সে পাঁচিলের দিকে ফিরিল। একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। জেলখানায় এক বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিল, চুরিতে দুয়ার লইয়া কারবার মানা—কারণ, দুয়ারের সম্মুখেই থাকে পথ—আর দুয়ার খুলিতে গেলেই শব্দ। দুয়ার লইয়া কারবার ডাকাতের—যাহারা দুয়ার রাখিতে পারিবে শক্তিবলে, তাহাদের। শশীই বলিয়াছিল—যদি ঠ্যাং চেপে ধরে ?—

বন্ধু উপদেশ দিয়াছিল—তেল মেখে যেয়ো। একটানেই 'তেলই—হাত পিছুলে গেলি'।

ভাবিতে ভাবিতে সে পাঁচিলের উপর উঠিয়া পড়িয়াছিল। লাফাইয়া পড়িল নিরাপদ গলিতে। মনে মনে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল শশী।

তারপর শুধু অভাব পূরণ নয়—এ এক নেশা। একটা খেলা!

মহাজন চন্দ মহাশয় তাহার মাল সমালদার। চন্দ মহাশয় শশীর পুরাতন পৃষ্ঠপোষক মহাজন। বহু কারবারের কারবারী,—ধান হইতে মনোহারী পর্য্যন্ত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি। শশীর সহিত নূতন কারবার ফাঁদিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাচের বাসনের কারবার খুলিয়া বসিলেন—'গ্লাস উইথ কেয়ার' রাণীমার্কা বাক্সে তিনি ফেরৎ কাচের বাসনের বদলে—কাঁসার বাসন পাঠান—সেখানে বিক্রয় হয়। শশী তাঁহার সারকুঁড়ে পুঁতিয়া মাল রাখিয়া আসে। দর, থালায় আট আনা, বাটি গেলাসে চার আনা—তাই সে শুধু থালাই চুরি করিয়া থাকে।—দিনে পঙ্গুর মত বসিয়া কাতরায়।

ভুল হইয়া গেল—অমৃত ঘোষালের বাড়ীতে; কয়েক মুহূর্ত্তের ভুল।

একটানা প্রায় মাইল দেড়েক দৌড়িয়া সে থামিল নদীর ধারে। নদীতে জল অবশ্য নাই—সুতরাং বাধার জন্য নয়; বুকের ভেতর ফুসফুসটা যেন আর শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ওদিকে—পূর্ব্বদিকও ফরসা হইয়া আসিয়াছে। নদী পার হইয়াই লোকালয়ের পর লোকালয়;—মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে বাদশাহী শড়ক—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পথটা জাগিয়া উঠিবে যেন আমীরী চালে। গাড়ী গরু লোকজন কলরব ধূলায় ভরিয়া উঠিবে। নদীর ঘাটের বাঁ দিকে একটা জঙ্গল—মহাশ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ—ওখানে নাকি পুষ্করা কাটায়; মানুষ ওদিকে যায় না। শশী ওই বাঁ দিকেই ফিরিল। দিগন্তশিখরে সূর্য্য তখন

উঠি-উঠি করিতেছে। শশী নিশাচরের মত অরণ্যের অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নদীর ধারে পলিমাটির উপর ঘনসন্নিবিষ্ট শীর্ণ দীর্ঘদেহ বড় বড় গাছ, নীচে কণ্টকগুল্ম সমাচ্ছন্ন। জঙ্গলটায় জানোয়ার নাই, সাপ আছে। শশী খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটা গুল্মের মধ্যে এক টুকরা পরিচ্ছন্ন স্থান বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগাধ ঘুম!

যখন সে উঠিল তখন সূর্য্য মাথার উপরে। শরতের আকাশের সূর্য্য—রৌদ্র প্রখর এবং পরিচ্ছন্ন; শাণিত সূচের মত শরীরে বেঁধে—সেই রৌদ্র গাছের ফাঁকে ফাঁকে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; এক ঝলক একেবারে মুখের উপর। পেটের ভিতরেও সূচ বিঁধিতেছিল। কাল খাইয়াছে সেই সন্ধ্যাবেলায়। তাহার উপর এই দুরন্ত দৌড়! বাপরে বাপরে! অমৃত ঘোষাল—বেটা বাম্‌না! বেটাকে যে এক চড় কষাইয়া দিতে পারিয়াছে—ইহাতেও দুঃখের মধ্যে সে আনন্দ অনুভব করিতেছে! একটা কামড় দিয়া বেটার নাকটা অথবা একটা কান কাটিয়া লইতে পারিলে সে আরও সুখী হইত। ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পেটের ভিতর সূচ বিঁধিতেছে। উপায় নাই। নদীর জল সে আঁজলায় ভরিয়া পেট পুরিয়া খাইল। ব্যস্। এইবার এক ছিলিম তামাক—নিদেন একটা বিড়ি হইলেই আর চাই কি? তাহাতে আর রাজাতে তফাৎ কি? আঃ—দারোগাবাবুর টাঙ্গির মত গোঁফ খানিকটা ছিঁড়িয়া আনিলেও পাতায় পুরিয়া বিড়ির মত খাওয়া চলিত। নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে সে আপন মনেই হাসিয়া সারা হইল। বিড়ির অভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল।

জাগিল সে সন্ধ্যায়। অন্ধকারের আভাসে অন্তরে অন্তরে তাহার চঞ্চল উল্লাস জাগিয়া উঠিল। প্রথমেই সে সন্তর্পণে জঙ্গলটার গভীর অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া এক প্রান্তে আসিয়া বসিল। সাপ জাতটাই অতি পাজী—ছুঁইলে আর রক্ষা নাই। অন্ধকার একটু ঘন হইতেই মাঠে আসিয়া একটা আকের ক্ষেতে

ঢুকিয়া বসিয়া বসিয়া আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মিষ্ট রস তাহার ভাল লাগে না—খানিকটা মদ হইত! মনে করিয়াই সে হাসিল—'কারে পড়িলে বাঘা ফড়িং খায়।' একগাছা শেষ করিয়া সে আর একগাছা আক চিবাইতে আরম্ভ করিল।

মাঠ জুড়িয়া শেয়াল ডাকিয়া উঠিতেই সে উঠিল। প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গেছে। গ্রাম নিশুতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে! মাঠে মাঠে সে আসিয়া আপনাদের পাড়ার অদূরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্তর্পণে আসিয়া ঘরের পিছনে একটা ঢিপির পাশে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

গুনগুন করিয়া কে কাঁদিতেছে! হাবলের মা। তাহাকে ডাকিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল তাহার। সে ডাকিতও—কিন্তু সেই মুহূর্তে খিল খিল হাসির শব্দে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সরলা হাসিতেছে। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সে হিংস্র হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই কাহার ভারী আওয়াজ কানে আসিল—আরে তু তো বহুত রসবতী আছে। তোহার বাবা শালা তো ভাগ্‌লো, আব—তো তুহার দিন আইল। আঁ—?

কনেষ্টবল। দারোগা পাহারা বসাইয়া রাখিয়াছে। শশী একটা হিংস্র কৌতুক অনুভব করিল। সে হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিছুদূর আসিয়া সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অভ্যস্ত নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হইল। প্রথমে কিছু আহার প্রয়োজন। তারপর 'চন্দ' মহাশয়কে তুলিয়া টাকা লইতে হইবে! পাঁচটা টাকা তাহার এখনও প্রাপ্য আছে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়া উঠিতেছে! খানিকটা শক্ত কিছু পেটে না পড়িলে আর চলে না! বেটা বামনা—অমৃত ঘোষালের রান্নাঘরে ঢুকিয়া—খাইয়া দাইয়া সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে কি হয়? বেটা বামনা কিন্তু ভয়ানক পাজী!

এ বাড়ীটা কাহার? পাঁচিলগুলা নীচু—ওই যে একটা ভাঙনও আছে। সে ঢুকিয়া পড়িল। গরীবের ঘর! হইলই বা, সে চায় খাদ্য, সম্পদের সন্ধানে তো সে আসে নাই। আবার সে ভাল করিয়া দেখিল, ঘরখানা খ্যামাঠাকরুণের।

ব্রাহ্মণের বিধবা—একটি মেয়ে একটি ছেলে। মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে ও-পাড়ার গাঁজাখোর হরিঠাকুরের সঙ্গে।

কিন্তু এত ভাবিবার তাহার সময় নাই। সে রান্নাঘরের দরজাটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাঁড়িতে হাত দিল—এই ভাত—তাৎপর এই কড়ায় তরকারী! সে গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। বাঃ ঠাকরুণ রাঁধিয়াছে বড় চমৎকার! খাসা—এ যেন অমৃত!

সহসা একটা কচি ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। শশী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে সন্তর্পণে বাহির হইয়া শয়নঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিল। ওঃ ওপাশে আর একটা দরজা—ঠাকরুণ এ যে হাজার দুয়ারী বানাইয়াছে রে বাবা! আবার সে আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এ খাদ্য সে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ছেলেটা এখনও কাঁদিতেছে।

—অ—বিম্‌লি—বিম্‌লি! ওলো অ এগুনি! ছেলে কেনে কাঁদে লো? বিমলা সাড়া দিল—মা! বলিয়া বোধ হয় ছেলেকে টানিয়া লইল—ছেলেটা চুপ করিয়াছে। ঠাকরুণ ও ঠাকুরণের মেয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে। কন্যা বিমলার বোধ হয় ছেলে হইয়াছে। এগুনিকে ডাকিল যে!

শশী তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

ঠাকরুণ বলিল—বিমলা!

—মা!

—তোর কানের ফুল দুটো আছে?

—না।

—নাই? ঠাকরুণ গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শশী স্পষ্ট শুনিল।

বিমলা বলিল—তোমার ঘুম আসেনি বুঝি, মা?

—কি যে করব আমি কাল—তাই ভেবে আমার ঘুম নাই মা। কাল তুই আঁতুড় থেকে বেরুবি, দাই বিদেয় করতে হবে, এগুনি বিদেয় করতে হবে।

পূজো-অর্চ্চা আছে। টাকা দূরে থাক—নাপতানীকে দেবার মত চাল সুদ্ধ ঘরে নাই।

ঠাকরুণের জন্য শশীর দুঃখ হইল। মনে মনে ঠাকরুণকে প্রণাম করিয়া সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। এইবার চন্দ মহাশয়ের কাছে। তারপর সটান দশবিশ ক্রোশ পাড়ি! হাবল আসিয়া আপনার দেখিয়া লইবে। সরলা হারামজাদীর নাম সে মুখে আনিবে না। হাবলের মাকে সে কোন রকমে খবর দিয়া আনাইয়া লইবে।

রাত্রি শেষ প্রহর।

শশী যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। আঃ ঠাকরুণের বড় অনিষ্ট করিয়া দিয়াছে সে! অন্যায় হইয়াছে তাহার। আঁতুড়ের খরচ, তাহার উপর বামুনের বিধবার সমস্ত হেঁসেল নষ্ট হইয়াছে। যাক গে! মরুক গে ঠাকরুণ, বুঝিয়া করিবে! সে চলিতে আরম্ভ করিল। আবার দাঁড়াইল। নাঃ—কাজটা ভাল হয় নাই! আহা বিধবা—গরীব!

সে আসিয়া ঠাকরুণের বাড়ীতে ঢুকিয়া তিনটি টাকা ট্যাক হইতে বাহির করিয়া দাওয়ার উপর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল—ওই 'এগুনি'টা যদি প্রথমে উঠে তবে তো ওই মারিয়া দিবে। সে টাকা তিনটি কুড়াইয়া লইল; সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল তিন-তিনটা টাকা! না! হইতেই পারে না। মরুক, ঠাকরুণ মরুক। কিন্তু তাহাতেও মনটা কেমন করিতেছে। সহসা অন্যমনস্ক শশীর শিথিল হাত হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—কে? ঠাকরুণ শঙ্কিত হইয়াই ছিল—ইহার পূর্ব্বে ঘরের শিকল দেওয়া দেখিয়া বিধবা পাড়াপড়শী জড়ো করিয়াছিল, রান্নাঘরের ব্যাপারও সকলে দেখিয়াছে!

শশীর কিন্তু আর সময় নাই—আঃ—কোথায় গেল টাকাটা ? চঞ্চল ত্রস্ততায় তাহার হাত কাঁপিতেছে ; সে কম্পনের মধ্যে বাকী দুইটাও ঠং ঠং শব্দে পড়িয়া গড়াইয়া গেল !

সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বৰ্দ্ধিত শঙ্কায় উচ্চতরকণ্ঠে বলিল—কে ?

টাকা ! তাহার টাকা ! শশী সরীসৃপের মত চারিদিক হাতড়াইয়া ফিরিল !

ওদিকে বিধবা হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর—চোর—

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা—ওঘরে মেয়ে এবং এগুলিটা ! শশী দাঁতে দাঁতে খামচ কাটিয়া দাওয়া হইতে উঠানে লাফ দিয়া পড়িয়াই ছুটিল। পাশের বাড়ীগুলাতেও লোক চেঁচাইতেছে। কাছেপিঠেই রামশরণ দারোগার গলা শোনা যাইতেছে। শশী গলিতে বাহির হইয়া ঠিক করিল—আজ সে দারোগার গোঁফ ছিঁড়িয়া লইবেই—যদি আজ সম্মুখে সে পড়ে। নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে গলির ভিতর দিয়া চলিল ; কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর একটুকরা বাঁকা চাঁদ উঠিয়াছে—অন্ধকার কালকের মতই স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে ! গলি শেষ হইতেই সে চমকিয়া উঠিল—গলির মুখেই লোক। দারোগা নিজে ও একজন কনেষ্টবল। সে ফিরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ওমাথাতেও লোকের সাড়া। লোক দুইটা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। শশী আর কোন চেষ্টা করিল না, সে হাত দুইটি বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—মেরেন না মশায়—হেই দারোগাবাবু !

দারোগা রামশরণ মহাকৌতুকে হা-হা করিয়া হাসিয়া শশীর বুকে ক্রেপসোল জুতার এক লাথি বসাইয়া দিলেন।

হাজতে বসিয়া—শশী ইসারা করিয়া একটা কনেষ্টবলকে ডাকিল—সরলার সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল এই ব্যক্তিই।

অত্যন্ত গোপনে কাছা হইতে বাকী দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—সরলাকে দিও !

হোলি

রাস্তা হইতেই বাড়ীটা বেশ পছন্দ হইল, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের জংশনের উপরেই তিনতলা বাড়ী। সামনে দক্ষিণে পার্ক ; দক্ষিণের বাতাস প্রচুর পাওয়া যাইবে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাড়ীখানি বেশ ঝরঝরে, এমন কি নীচের তলাতেও ধরিত্রী-গর্ভের ভোগবতীর করুণা বেগবতী নয়। দোতালায় উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না, বারান্দাটাই মন হরণ করিয়া লইল ;— শুধু আরামপ্রদই নয় ; বেশ একটি আভিজাত্যও আছে। বসন্তকাল—সন্ধ্যায় একখানা ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিলেই —স্বর্গসুখ না হউক—ত্রিশঙ্কুলোকের সুখটাও অন্তত পাওয়া যাইবে।

সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিলেন, বেশ জায়গা, এইখানেই জমিয়ে ব'স।...কি, চুপ ক'রে রয়েছ যে ?

মেস, বাসা, বা একখানা ঘর—মোট কথা একটা 'মন্দ-নয়-গোছের' আশ্রয় খুঁজিয়া আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—ওতে আর কথা নেই ব'লেই ত চুপ ক'রে আছি।

আসলে মনে মনে আয়ব্যয়ের হিসাব কষিয়া দেখিতেছিলাম নীচের অঙ্কটা প্লাস, কি মাইনাস, কি ব্যোমচিহ্নে দাঁড়ায়। বন্ধুও একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন —নামটা কিন্তু শান্তিভবন না হয়ে শান্তিকুঞ্জ হ'লে ভাল হ'ত। লেখায় খানিকটা ইনস্পিরেশন পাওয়া যেত।

বলিলাম—মরুক গে, what's in a name ব'লে দ্বিগুণিত উৎসাহে লেগে পড়া যাবে।

বন্ধু বলিলেন—বাস্, তবে চল, টাকা জমা দিয়ে ফেল ; কালই এখানে চ'লে এস।

একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন, কাল আবার দিনটা কেমন আছে—

বাধা দিয়া বলিলাম—অরক্ষণীয়া হ'লে তার আর অকাল নেই, আশ্রয়হীনের পক্ষে দরজা খোলা পেলেই গৃহপ্রবেশের লগ্ন। এতে আর পাঁজি দেখবার দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে টাকা জমা দিয়া নয়-নম্বর ঘরখানি পছন্দ করিয়া ফেলিলাম এবং একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বাত্যাতাড়িত পত্র-জীবনে 'স্পীড' আছে সত্য, কিন্তু তার চেয়ে মৃত্তিকাতলস্থ হইয়া বিগলিত হওয়াও আরামের, খানিকটা আমিরী আছে—দিন রাত্রি ঘুমাইলেও কেহ কিছু বলিবে না।

বেশ জায়গা, একেবারে খাঁটি শহরে আবহাওয়া। কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও দরজায় তালা পড়ে। পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁড়িতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা-না-বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখাশুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানে হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলা চলে না—করমর্দ্দন করাও হয় না। কয়টি প্রাণী মাত্র সর্ব্বজনপরিচিত—কালী, নরেশ, ভজ এবং লোচন। সকলে ইহাদের বিশ্বাসও করে; সে অবশ্য বাধ্য হইয়া, কারণ উহাদের দুইজন চাকর, অপর দুইজন ঠাকুর। আর একটি প্রাণী—একটা লাল রঙের বিড়াল—সে সব ঘরেই যায়, আপন ভাষায় দুই একটা কথাও বলে, কখন কখন কাপ ডিসও ভাঙে, কোন কোন দিন পাশে শুইয়া গলা ঘড়ঘড় করিয়া আদরও জানায়। আমি উহার নাম দিয়াছি—'রাঙা-সখী'।

আর একজন সর্ব্বপরিচিত আছেন, কিন্তু তিনি নিজে নির্ব্বাক। প্রায়-বৃদ্ধ শীর্ণ

দীর্ঘকায় লোকটির নাকটি খাঁড়ার মত তীক্ষ্ণ, কুঞ্চিত ললাট, চোখের দৃষ্টিতে অপরিসীম রুক্ষতা, এক দৃষ্টিতে যেমন চিনাইয়াও দেয়, তেমনই যেন বলিয়াও দেয়—'দূরমপসর'।

প্রথম দিনই তাহাকে চিনিলাম। রাত্রে খাবার ঘরে একটা কোণে ভদ্রলোক খাইতে বসিয়াছিলেন, খাইবার স্থানটিও দেখিলাম একটু স্বতন্ত্র। প্রথমেই ভজহরি তাঁহার খাবার আনিয়া দিল। তিনি প্রথমে থালাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন, তারপর একবার ভজহরির দিকে সেই দৃষ্টিতে চাহিলেন! তারপর নিঃশব্দে থালাটা একটু টানিয়া লইয়া আহারে মনোনিবেশ করিলেন। আরও কয়জন খাইতে বসিয়াছিলেন, সকলেই দেখিলাম—একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক নীরবেই আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কালী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও ভদ্রলোক কে কালী ?

কুঁজায় জল দিতে দিতে কালী বলিল, কে বলুন দেখি ?

—ওই যে গায়ের রং খুব ফরসা—লম্বা মানুষটি !

—নাকটা খুব ধারালো—ওই উনি তো ?

—নাকে ধার আছে কিনা জানি না, তবে খাঁড়ার মত বলে বটে ওরকম নাককে। —অনেকক্ষণ কথা না বলিয়া কেমন যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম, কালীর সহিতই রসিকতা করিয়া যেন একটু হাল্কা হইলাম। কালীর বোধশক্তি কম বলিয়াই ভাল চাকর হিসাবে খ্যাতি আছে। সসম্ভ্রমে চাপা-গলায় উত্তর দিল—ওরে বাপরে! আগুনের মত লোক বাবু! রাগলে আর রক্ষে নাই। তবে কারু সঙ্গে ছোঁয়াচ নাই, ওই আপিস যান, আর এসে আপনার ঘরটিতে—বাস্।

তারপর ইঙ্গিতে পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিল। বুঝিলাম—পাশের ঘরেই আছেন তিনি। আমিও চাপা গলায় বলিলাম, কিন্তু লোকটি কে কালী—সে কথা তো বললে না ?

নাম তো জানি না বাবু, তবে এখানে সবাই বলে—বিশ্বামিত্র ঋষি! এখানে

আছেন উনি অনেক দিন থেকে, আমি আসবার আগে থেকেই আছেন। আমি এসে ঐ নামই শুনছি। কিন্তু ও তো মানুষের নাম হয় না—উনি রাগী ব'লেই বলে। তবে চাকরি করেন মোটা।

সে পরিচয়ও পাইলাম, পরদিন দশটার সময় দেখিলাম—দামী একটা স্যুট পরিয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন। বোর্ডিঙের দরজায় একটা ফিটনও দাঁড়াইয়া ছিল। বৈকালেও ফিটনেই ফিরিলেন। দেখিলাম—আমার পাশের ঘরেই ভদ্রলোক থাকেন। একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। স্বর্গলোক দূর বলিয়াই দেবতা করুণাময়, মানুষকে আশীর্ব্বাদ করেন। পাশাপাশি বাস করিতে হইলে ঘেঁষাঘেঁষির অপরাধে অভিশাপেই একদিন নরলোক পরলোকবাসী হইত, ইহাতে বোধ করি কেহই সন্দেহ করিবে না।

মরা-গাছকে কবিরা বলিয়া থাকেন 'নীরস তরুবর'; কিন্তু গল্প লেখকের কাছে বিশেষণের উপর প্রসাধন চলে না, সেখানে 'শুষ্কং-কাষ্ঠং'-টাই ভাল। আমি ওঁর নামকরণ করিলাম 'শুষ্ক কাষ্ঠ'। প্রথম কয়েক দিন উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বুঝিলাম, একেবারে শুধু শুষ্কই নয়, সার বলিয়াও ভিতরে কিছুই নাই—চিরিয়া কাঠের পুতুলও গড়া যাইবে না। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া গল্প লিখিতে বসিলাম। কিন্তু সেও খুব সহজ হইল না। বিঘ্নরাজ যেন সহসা মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিয়াছেন। ট্রামের শব্দ, বাসের গর্জ্জন—ও দুইটা কোন ক্ষতি করে না, গৃহ-পালিত জানোয়ারের মত কলরবই করে, ডাক দিতে পারে না। কিন্তু এ কয় দিনে —রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রার বীরনাদে, মোহরমের সমারোহের জয়ধ্বনিতে আমার মনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। রাস্তায় মানুষের কলরব মনের কান ধরিয়া টান দেয়, লেখা ফেলিয়া ছুটিয়া যাই অভিনব একটা কিছু দেখিবার প্রত্যাশায়। মধ্যে মধ্যে পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বিশ্বামিত্র আবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেন। কয়েক বার লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ললাটে নব কুঞ্চনরেখা

দেখা দিবার আর স্থান নাই। ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

এত বিঘ্ন সত্ত্বেও লেখাটা কিন্তু শেষ হইল। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কারণ মোহরমের পরই হোলি, মহাত্মার আগমন,—জয়ধ্বনির টেম্পারেচার হু-হু করিয়া উপর দিকে উঠিবে। লেখা শেষ হইতেই খুশি হইয়া টেলিফোন-যোগে কয়েকজন বন্ধুকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ জানাইয়া ফেলিলাম। লেখা শুনিয়া বিচার করিয়া মতামত দিবেন। ডাব বরফ ও চা সিগারেটের বন্দোবস্তও ভাল করিয়াই করিলাম। এখানে আমি সনাতনপন্থী—মেয়ে দেখাইয়া আসরে মিষ্ট মুখের প্রয়োজন বিশেষ করিয়াই স্বীকার করি।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আসর জমিয়া উঠিল। সকরুণ করুণ রসের গল্প এবং সে অল্পও নয়—এক্সারসাইজ-বুকের ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা। বাংলা দেশে করুণ রসই জমে ভাল ; আর তা ছাড়া আর আছেই বা কি ? বাংলার তারুণ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে তারুণ্য রাম-লক্ষ্মণের মত নাগপাশে বন্দী। বাকি যাঁরা, তাঁরা সত্যকার জোরের অভাবে ভাবের ঘরে চোরের মতই কলরব করেন। তাঁদের আস্ফালন প্রলাপের মত অর্থহীন, বিলাপের মতই করুণ। তার চেয়ে সত্যকার অর্থপূর্ণ করুণ রসই ভাল। দুঃখের পর দুঃখ, মৃত্যুর পর মৃত্যু,—ঊনপঞ্চাশ পাতায় সাতটি মৃত্যু আমি ঘটাইয়াছিলাম ; সুতরাং রসের সপ্তম স্বর্গে গল্প আমার উঠিয়া গিয়াছিল! শেষ হইলে সকলের চোখ ছল ছল করিতেছে দেখিলাম।

একজন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যিকার রং তোমার আছে—দোকানের কেনা রং নয়।

অপর একজন বলিলেন, এ-ই জীবন।

যাক, সকলকে বিদায় দিয়া পরিতৃপ্ত মনেই বারান্দায় ঈজিচেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

—আপনিই পাশের ঘরে থাকেন ?

প্রশ্ন শুনিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম—বিশ্বামিত্র ঋষি! সেই বিরক্তিভরা মুখ, কুঞ্চিত ললাট, তিক্ত দৃষ্টি! আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করেন আপনি ?

সবিনয়ে বলিলাম—আমি একজন লেখক!

—হুঁ। কিন্তু এত চীৎকার ক'রে পড়াটা আপনার উচিত নয়। পাশের প্রতিবেশীদের জন্যে আপনার বিবেচনা থাকা দরকার।

গল্পটা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতামত পাইলে হয়তো কলহ করিয়াই বসিতাম; কিন্তু প্রাপ্তির ভারে মনটা ছিল অবনত, সুতরাং বিনীতভাবেই বলিলাম—মার্জ্জনা করবেন, সত্যিই আমার দোষ হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন আর হবে না।

ভাবিয়াছিলাম, ইহার পর আর জমিবে না, ভদ্রলোক চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু আমাকে বিস্মিত করিয়া তিনি একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন! আমিও বসিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন, আজ যেটা পড়লেন, ওটা আপনার লেখা ?

আরও একটু খুশি হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন—কিন্তু এ কি সত্যি ?

উত্তর দিলাম—বাংলার পল্লীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে দেখতেন, এতটুকু অতিরঞ্জিত করি নি আমি। বাংলার দুঃখের—

অসহিষ্ণু হইয়া তিনি বলিলেন,—সে প্রশ্ন আমি করছি না। ও আর কি দুঃখ, একের পর এক ক'রে তিনবার সংসার ক'রে আটটা ছেলে, তিনটে স্ত্রী—এগারোটা আমার গেছে, ও আমি জানি। কিন্তু তা ব'লে আনন্দ সুখ শোক দুঃখ—এগুলো কি সত্য ?

একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম; ভাবিতেছিলাম, কি উত্তর দিব। তিনি আবার অসহিষ্ণুর মতই বলিলেন,—কি বলেন আপনি ?

এবার বলিলাম,—সত্যি বই কি! কারণ এইগুলোই তো জীবনকে চালিত করছে।

তিনি ঘৃণাভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনি অতি নিকৃষ্ট জীব!

বলিয়াই তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই নীচে একটা কলরব শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম; ভিতরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, গুটি তিরিশেক ছেলে নিজেরাই বাক্স বিছানা মাথায় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কালী বলিল, মাট্রিক পরীক্ষা দেবে সব! এইখানে বাসা নিয়েছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বোর্ডিংটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল!

—In this age—newspaper—newspaper—

কিছুক্ষণ পরেই একজন শিক্ষক আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বোর্ডিঙের বোর্ডে আমার নাম দেখিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন। তিনি নাকি ধন্য হইলেন, আমিও অবশ্য পুলকিত হইলাম। তাঁহারই কাছে শুনিলাম,—ফিস্ ফিস্ করিয়া তিনি বলিলেন, Newspaper Essayটা এবার এসে গেছে মশায়। খুব গোপনে আমরা জানতে পেরেছি।

হাসিয়া বলিলাম,—ছেলেদের মনে মনে পড়তে বলুন, তা হ'লে।

তিনি বলিলেন,—না, চেঁচিয়ে পড়লেই মুখস্থ হবে চট ক'রে।

ভোর তিনটার সময় একটা কোরাস জাতীয় চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম—newspaper, newspaper.

উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শেষরাত্রির কলিকাতা—শান্ত, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—একটা বিরাট জীবন ঘুমঘোরে অচেতন। অপূর্ব্ব অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ভরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, এই ঘুম-রহস্যাচ্ছন্ন পুরীটির পথে পথে একবার

বেড়াইয়া আসি। মুখ হাত ধুইতে গেলাম। দেখিলাম, কল-ঘর বন্ধ, ভিতরে 'ওয়াক,—ওয়াক, এও—এও' শব্দে স্থানটা মুখরিত। কেহ যেন উদরের মধ্য হইতে অন্ত্রপাতি বাহির করিয়া ধুইয়া লইতেছে। ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরই খড়মের শব্দ শুনিয়া দেখিলাম, বিশ্বামিত্র ঋষি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। এদিকে ততক্ষণে রাস্তায় ময়লা-গাড়ি চলিতে শুরু করিয়াছে, আঁকশি কাঁধে করিয়া জনকয়েক উড়িয়া ছুটিয়াছে রাস্তার আলো নিভাইতে।

—ছেলেগুলো লাইফ ইম্পসিবল্ ক'রে তুলেছে!

আমি একটু হাসিলাম। তিনি বলিলেন,—দেখুন, কাল সন্ধ্যাবেলা আপনাকে রূঢ় কথা বলেছি।

এ কথারও কোন উত্তর দিলাম না। অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে, তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভদ্রতাটা মাত্রাতীত ভণ্ডামি।

তিনি আবার বলিলেন,—বেদ-বেদান্ত মায়া-বাদফাদ আমি আওড়াই না। ওসব আমি পড়িও না। এ হ'ল আমার জীবনের রিয়েলাইজেশন—আনন্দ-সুখ, শোক-দুঃখ—কোনটাই আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। আমি বেশ আছি।

সংসারে মত লইয়া তর্ক করার চেয়ে পাওনা-গণ্ডা লইয়া কলহ করাকেও আমি শ্রেয় বোধ করি। সুতরাং একথারও জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ অস্ত যাইতেছে। কাল ত' পূর্ণিমা—বাসন্তী-পূর্ণিমা—দোল—হোলি! এক মুহূর্ত্তের জন্য স্ত্রীকে মনে পড়িয়া গেল।

তিনি আবার বলিলেন,—আপনার নামটি কি?

নাম বলিলাম।

তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—কোথায় বাড়ি?

সে পরিচয়ও দিলাম।

তিনি অকস্মাৎ হাতটা ধরিয়া বলিলেন,—তুমি হীরুর জামাই?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, বলিলাম—তাঁকে কি আপনি জানতেন?

—জানতেন ? তুমি একটি হনুমান। আমি যে হীরুর কাকা !

—তাঁর কাকা ?

—হ্যাঁ গো। মানে—তুমি আমার নাত-জামাই। আমার বাবা ছিলেন আমির কুলীন, ষাটটা বিয়ে করেছিলেন তিনি, জান তো ? তোমার দাদাশ্বশুর আর আমি হলাম সৎ-ভাই। কানাই মুখুজ্জের নাম শুনেছ ?

—আপনি ? – তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন—আমি।

গল্পের মতই ইঁহার কাহিনী শুনিয়াছি। এককালে ইনি লক্ষপতি হইয়াছিলেন খনিজ সম্পদের ব্যবসায়ে। শুনিয়াছি, রূঢ় তাগাদার জন্য একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকার জোরে চাকা ঘুরিয়া গিয়াছিল। আবার সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কাহিনীও শুনিয়াছি। এখন দালালি করেন বোধ হয়। কয়েকটা কুশলপ্রশ্ন করিয়াই তিনি ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন,—দোলে বাড়ি যাবে না ?

—না।

—ইডিয়ট কোথাকার ! রমা কার সঙ্গে রঙ খেলবে ?

—আপনি যান বরং আমার হয়ে।

—ওরে রাস্কেল ! আমি না হয় তার দেহে রঙ দিতে পারি, তুই না হ'লে তার মনে রঙ ধরাবে কে ?

—কাজ রয়েছে দাদু, উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—উঃ, আমাদের সে এক হোলিখেলা ছিল ; বাগানবাড়ি, মদ, বাইজী,—জলের মত টাকা খরচ করেছি ! জীবনে ট্রাজেডি ঘটবার পরও করেছি ; কিন্তু সুখ-আনন্দ কোথায় ? সেইই তো বলছিলাম, ওসব মিথ্যে !

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—তুমি তো সিগারেট খাও! খাও, খাও, লজ্জা ক'র না। জান তো, 'ইয়ারের বয়স হয় না জাঁহাপনা'। আমি তোমার ইয়ার।

তবুও সিগারেট খাইতে পারিলাম না।

তিনি উঠিয়া বলিলেন,—নাঃ, তোমার কষ্ট হবে, আমি উঠি।

আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—টাকাকড়ির অভাবেই কি বাড়ি যাচ্ছ না তুমি? আমি দিচ্ছি, এখনও লাষ্ট ট্রেন ধ'রে যেতে পারবে।

উঠিয়া বলিলাম,—না দাদু, সত্যিই আমার কাজ রয়েছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, দাদুর ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। একবার ডাকিলাম, দাদু!

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, শরীর খারাপ, বিরক্ত ক'র না আমায়!

নীচে রাস্তায় কে চীৎকার করিয়া উঠিল, এই—এই—না—না।

রেলিঙে বুক দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলাম, হোলি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ছেলের দল একটা গলির মোড় হইতে একজন ভদ্রলোককে তাড়া করিয়া চলিয়াছে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিতেছেন, না, না। আশেপাশের বোর্ডিংগুলিতে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার মত দর্শকের দল অনেক। সকলেই রঙের ভয়ে বিব্রত, অথচ নীচের খেলা দেখিয়া বেশ হাসিতেছেন। আমাদের বোর্ডিংয়ের ছেলের দল রাস্তার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ও দৃষ্টি—ও হাসির অর্থ আমি বুঝি, সকলেই চায় ওই অমনই মাতামাতি করিতে। কিন্তু সমাজ-জীবনে বাধ্যবাধকতায় অভ্যাস-করা সংযম সঙ্কোচের রূপ ধরিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। আমি জানি ও সঙ্কোচ থাকিবে না; হোলির রঙ অকস্মাৎ একসময় বন্যার মত আবেগে সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিবে।

আরব বেদুইন হইবার সাধ তো একা মহাকবির নয়, শত বন্ধনে আবদ্ধ সমগ্র মানবজাতির অন্তরের কথা। হইলও তাই।

বেলার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্য, সমস্ত রাস্তাটা রঙ-মাখা মানুষে ভরিয়া গেল। বোর্ডিঙের বারান্দাগুলিতেও রঙ লইয়া মাতামাতি। সম্মুখের বোর্ডিংটিতে একটি প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক,—মাথায় বাবরি চুল, কিন্তু মধ্যদেশে একটি টাক,—তাঁহাকে আমার বেশ লাগিল। তিনি মাখিয়াছেন অনেক রকম—আবীর, রঙ, সোনালি রূপালি, লাল, নীল, বেগুনে, সবুজ, জর্দ্দা, তাহার সঙ্গে ধূলা-রঙও আছে। দুই হাতে তিনি রূপালি ধূলা-রঙ মাখিয়া সবিনয়ে সকলকে মুখে মাখিবার জন্য কাতর অনুরোধ করিতেছেন। ভাবে বোধ হইল লোকে রঙ মাখিলে তিনি হাতে স্বর্গ পাইবেন। ক্রমে ক্রমে চারিদিক রঙে ভরিয়া গেল। রাস্তায় রঙ, ট্রামে রঙ, বাড়ীর দেওয়ালে রঙ, আমার মনের মধ্যে দেখিলাম সেখানেও রঙের আমেজ ধরিয়াছে।

পিছনে হৈ হৈ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের বোর্ডিঙেও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তারপরই যুবকের দল, তারপর সকলেই। সমস্ত অপরিচয়ের প্রাচীর যেন আজ ভাঙিয়া গেল। শুধু ওই বিশ্বামিত্রের দ্বার রুদ্ধ! কিছুক্ষণ পরই বন্ধুর দল আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। যখন রঙ খেলিয়া বাড়ি ফিরিলাম, তখন বেলা চারিটা।

দাদুর দুয়ার বন্ধই রহিয়াছে।

ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

দাদু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারটাও ভেজাইয়া দিলেন। আমি উঠিয়া বসিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—রঙ কেমন খেললে?

—সে আর বলবেন না, তবে এ রঙ খেলা নয়, বেরঙের খেলা। কালি, আলকাতরা, কাদা,—এই বেশি।

টেবিলের উপর খানিকটা আবীর তখনও পড়িয়া ছিল, সেদিকে চাহিয়া তিনি

বলিলেন, আবীরটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ, কুম্‌কুমটা আরও ভাল, ওতে রঙের সঙ্গে কৌতুকও আছে।

স্বীকার করিয়া বলিলাম,—তা ঠিক।

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, একটা অনুরোধ করব তোমাকে, রাখবে বল?

আবেগভরেই বলিলাম,—অনুরোধ কেন দাদু? আদেশ বলুন। আপনার আদেশ কি অমান্য করতে পারি?

—তবে বাক্স গুছিয়ে নাও, বাড়ী যাও; আটটার এক্সপ্রেসে গেলে বারোটায় বাড়ী পৌঁছবে। রমার সঙ্গে রঙ খেলে এস। চল, আমি তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।

আমারও মনটা কেমন রঙে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলাম।

দাদু ততক্ষণে ট্যাক্সি ডাকাইয়াছেন। পথে গাড়ী থামাইয়া রমার জন্য বাসন্তী রঙের শাড়ি, আমার জন্য ধুতি, কুম্‌কুম, আবীর, রঙ, পিচকারি কিনিয়া মিষ্টির দোকানে গাড়ী থামাইলেন।

আমি বলিলাম, মিষ্টি আবার কেন দাদু?

তিনি বলিলেন, শালা, তুই রমাকে খাইয়ে দিবি, রমা তোকে খাইয়ে দেবে।

তিনি নিজে টিকিট করিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—রমাকে আমার কথা বলবি।

চুরির নেশা এই ডোম বংশটির রক্তের কণায় কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিতভাবে করিয়া আসিতেছে। টাকা নয়, তৈজসপত্র নয়, শুধু ধান। ধানের মরাই হইতে সুকৌশলে ধান বাহির করিয়া লয়, ধানের গোলার দুয়ারে যেমনই তালা দেওয়া থাকুক না—সে তালা তাহারা খুলিয়া ফেলিবেই, এবং সুকৌশলে আবার বন্ধও করিয়া দিয়া যাইবে।

শশী ডোম এখন দলের নেতা, দীঘল ছিপছিপে শরীর, গতি যেন বায়ুর মত, একহাত ব্যবধান হইতেও তাহার পিছনে ছুটিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিশের লোকে মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে—'বেটা যদি সিঁদ দিতে আরম্ভ করত তবে আর রক্ষে থাকত না'। শশীও সে কথা বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু কখন সিঁদ দিতে সে চেষ্টা করে না। তাহাদের বংশানুক্রমিক চুরির ধারা-পদ্ধতি ছাড়া অন্য ধারাপদ্ধতি তাহার ভাল লাগে না।

শশী বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার ছেলে হাবল আসিয়া বলিল—আজকে তো আমাবস্যে রইছে গো; কালিতলায় ফিঙের পূজোটা দিলে না কেনে? আজ ওকে বার কর, বেশ তো ডাগর হইছে।

—হুঁ। শশী চিন্তাকুলভাবে বলিল—হুঁ। তারপর সে হুঁকাটি পুত্রের হাতে দিয়া বলিল, পারবে হ্যাঁরে, ফিঙে পারবে?

হাবল বলিল—পারবে না কেনে? সে একবারে লাফ মারছে।

—হুঁ। তবে নিয়ে আয়, একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে আয়; কালীতলায় যে পূজো আজকে।

ফিঙে অদূরে একটু আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে আনন্দের আতিশয্যে সত্যই একটা লাফ দিয়া উঠিল।

ফিঙে শশীর দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠের সন্তান, একমাত্র সন্তান। ফিঙের বাপ নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই মারা গিয়াছে। ফিঙের মা তাহাদের সমাজে প্রচলিত অনুকূল বিধান সত্ত্বেও আর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঝি-গিরি করিয়া ফিঙেকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। দশ এগার বৎসর বয়স হইতেই ফিঙেও মায়ের মনিবের বাড়ীতে গরুর রাখালের কাজ করিতেছে। এখন সে আর গরুর রাখাল নয়—ষোল সতের বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মাহিন্দারের পদে উপনীত হইয়াছে ; অর্থাৎ গোচারণের পরিবর্ত্তে গরুর তদ্‌বির তদারক এবং মনিববাড়ীর কাঠ-চেলানো—গাড়ী লইয়া যাওয়া, দুই চারিটা ডাক হাঁক প্রভৃতি কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছে! কিন্তু এ তাহার বেশ ভাল লাগে না। তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠী যখন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে উঠিয়া বাড়ী হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায় তখন তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে, সে অকারণে তাহার মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কারণ বার বার বাধা দেয় তাহার মা। ফিঙের মা সত্যই বাধা দেয়, ফিঙে বড় দুর্ব্বল—ষোল সতের বৎসর বয়স হইলেও ফিঙেকে দেখিয়া মনে হয় তের চৌদ্দ বৎসরের বালক। এ প্রস্তাব উঠিলেই ফিঙের মা কাঁদে, বলে,—ওরে জেল হলে তু আর বাঁচবি নারে! তোকে ঠিক ধ'রে ফেলাবে।

ফিঙে তর্জ্জন করিতে থাকে, মাকে গালিগালাজ করিয়া বলে—না বাঁচবে না! হারামজাদী—জেল থেকে ফিরে এলে হাবলদাদার গতর কেমন হয়েছিল, দেখেছিলি! কাকার গতর দেখেছিলি!

সত্য! যাহারা জেলে যায়—তাহারা ফেরে সবলতর দৃঢ়তর দেহ লইয়া, নিজেরাই রসিকতা করিয়া বলে—জেলের ভাতের গুণ কি, আর মিষ্টি কি! তার-

পর গম্ভীর ভাবেও বলে—জিনিস সব খাঁটি কিনা, ত্যাল সে তোমার ঝাড়া সরষে, ময়দা সে একেবারে ঝরঝরে গম, ইয়া মোটা মোটা ছোলা, লাল সেরাক্ মুশুরি !

হাবল গল্প করিয়াছে বিড়ি গাঁজা সব মেলে, মেলে না কেবল মদ।

ফিঙে আরও উত্তেজিত হইয়া মাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, ফিঙের মা শুধু অঝোরঝরে কাঁদে। কান্নাটা উহার চোখের ডগায় যেন লাগিয়া থাকে। আজও ফিঙের মা কাঁদিল। কিন্তু ফিঙে আজ দৃঢ়সংকল্প, সে সেসব গ্রাহ্যই করিল না। আপন সঞ্চিত অর্থ হইতে দেড়টি টাকা লইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত পাঁঠা কিনিতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতেই সদলে শশী মদ লইয়া বসিয়াছিল। ফিঙেও বসিয়াছে, সেইতো আজ নায়ক। আজ সে অকারণে হা-হা করিয়া হাসিতেছে, অশ্লীল গান করিতেছে—তাহার মনের উত্তেজনা—আনন্দ যেন তুবড়ীর আলোক-স্ফুলিঙ্গের মত ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে।

ফিঙের মা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল, সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে।

শশী বলিল—বউ, তুই ভাবিস না, ফিঙে আমাদের ভারি টাটোয়ার হইছে। কেউ ওকে ধরতে লারবে।

ফিঙে পরম আনন্দে গান ধরিল—'সুড়ুৎ করে পালিয়ে যাব গিরগিটির মতন'।

ফিঙের মা জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।

আষাঢ় মাস, অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে ঘনঘটা মেঘ ছিল না, কিন্তু পাতলা একটা মেঘের আবরণের মধ্যে আকাশের তারাগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিশাচরের দল দ্রুত নিঃশব্দে চলিয়াছে, কাহারও মুখে কথা নাই। ফিঙে কেবল শব্দ শুনিতে পাইতেছে, কি যেন একটা ধক্ ধক্ করিয়া তাহারই বুকের মধ্যে চলিতেছে।

কৃপণ ফ্যালারাম চৌধুরীর প্রচুর ধান। কিন্তু যেমন কুৎসিত বনমানুষের মত

চেহারা—লোকটাও তেমনি বর্ব্বর। ফিঙে তাহাকে দেখিয়াছে ; দিনেও লোকটাকে দেখিয়া ভয় হয়। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; অবিরাম একটা কম্পন ট্রেনের কম্পনের মত বহিয়া যাইতেছিল। শশী হাবলকে কাঁধে করিয়া প্রাচীরের উপর তুলিয়া দিল। হাবল প্রাচীরের উপর বসিয়াই বলিয়া উঠিল 'লোক'! সঙ্গে সঙ্গে সে ঝপ করিয়া লাফ দিয়া পড়িল, বলিল,—পালাও।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীবাড়ীর বাহিরে আশপাশ হইতে দশ পনের জন লোক ছুটিয়া আসিল। মুহূর্ত্তে নিশাচরের দলও ছুটিল। যেন মায়াবীর মতই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ফিঙেও ছুটিয়াছিল, কিন্তু দলের কে কোন্ দিকে যে গেল—সে ঠাওর করিতে পারিল না। দুর্দ্দান্ত ভয়ে সে গাছের পাতার মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। কোন্ দিকে যে সে চলিয়াছে তাহার ঠাওর ছিল না। অকস্মাৎ পায়ে একটা কি জড়াইয়া গেল। সাপ! সে ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া সেইখানেই উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। না, সাপ না, সাপ না, একটা লতা পায়ে বাধিয়া গিয়াছে। উঃ লতাটার সর্ব্বাঙ্গে কি কাঁটা! পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

'এইখানেই – এইখানেই আছে। এইখান থেকেই শব্দ উঠছে।'

ভয়ের উত্তেজনায় ফিঙের সর্ব্বশরীরে রক্ত দ্রুততর গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বন্দুকের গুলিতে মাথা উড়িয়া যাওয়ায় পাখী যে গতিবেগে সিকি মাইলের উপর উড়িয়া গিয়া পড়ে সেই উত্তেজনায় সেই গতিবেগে ফিঙে আবার ছুটিল। জঙ্গল ঠেলিয়া বাহির হইতেই দশ বারো জনে চীৎকার করিয়া উঠিল।

—ওই—ওই! ওই পালাল শালা!

দৌড়, দৌড়। ফিঙে ছুটিয়াছে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া। এ কি, সে কোথায় আসিয়া পড়িল! পুকুর—সামনে যে একটা পুকুর! মুহূর্ত্তে ফিঙে পুকুরে নামিয়াই পড়িল। আকণ্ঠ ডুবিয়া পানা ও শালুকের দামের মধ্যে মাথাটা জাগাইয়া বসিয়া রহিল। আঃ শরীরটা ঠাণ্ডা জলে যেন জুড়াইয়া গেল।

পিছনে পিছনে অনুসরণকারী দল আসিয়া পুকুর পাড়ে দাঁড়াইয়া বলিল—কোন্ দিকে গেল ? ফিঙে আর সাহস করিয়া জলের উপর মাথা জাগাইয়া থাকিতে পারিল না, বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস লইয়া ডুব দিল। কিন্তু ভয় ও উত্তেজনার মুখে নিঃশব্দে ডুবিতে পারিল না, জল আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই—ওই শালা জলে ডুবেছে। আলো—আলো! আলো আসিল।

জলের ভিতরে রুদ্ধশ্বাসে ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইতেছে! ফিঙে ভাসিয়া উঠিল উন্মত্তের মত; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পড়িল একটা লাঠি! চারিদিকে উন্মত্ত জনতার উত্তেজিত কোলাহল—ওই—ওই!

—লাগাও লাঠি।

—মার শালাকে জলে ডুবিয়ে।

—ওই—ডুবেছে শালা!

—হুই—ভেসে উঠেছে মাঝ জলে।

সঙ্গে সঙ্গে দু' তিনজন জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জনতার একাংশ ভাঙিয়া ও'পাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। কতকগুলি ছোট ছেলেও আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে; তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছে, আর প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে—ওই—ওই। হুই—ও!

ফিঙে আবার ডুবিল, তাহার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—সে আর পারিতেছে না; এ দিকে, পিছনে সাঁতার দিয়া উহারা আসিয়া পড়িয়াছে।

কৌতুক ভরে একজন বলিল—ডুবেছে রে শালা—ফের ডুবেছে।

—হুই উঠেছে! পাড়ের ধারে ধারে। হুই!

গ্রামের দুষ্ট কুকুরকে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিবার সময় যেমন একটা দর্পিত শিকারের আনন্দ মানুষকে শক্তির উচ্ছ্বাসে পাগল করিয়া তোলে, তেমনি ভাবেই জনতা পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ফিঙে মাথা তুলিতেই একজন সতর্কিত

লক্ষ্যে বসাইয়া দিল তাহার লাঠি। ফিঙে এবার আর ইচ্ছা করিয়া ডুবিল না, আপনি ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিল—শালা—আবার ডুববে মনে করেছ?

কলরব—কোলাহলে নিস্তব্ধ রাত্রির পৃথিবী মুখর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চোর!—চোর ধরা পড়িয়াছে!

—মার—শালাকে মার! কিল, চড়, লাথি, বেত, লাঠি,—লাগাও শালাকে। বল্ শালা—আর কে কে ছিল?

ফিঙে নীরব। অদ্ভুত অবস্থা তাহার, প্রহারে আর যেন বেদনা বোধ হইতেছে না। এতগুলা লোক সব যেন তাহার চারিদিকে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। ইঃ, মানুষের মুখগুলা কেমন লম্বা হইয়া যাইতেছে!

একটি মুখ শুধু অবিকৃত, সে তাহার মায়ের মুখ। হারামজাদী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে!

—এই আর মারিস না, মরে যাবে! এই-এই!

জনতার কৌতুক অবসন্ন হইয়া স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। একজন বলিল, নে এইবার তামাক সাজ দেখি একবার।

একদল ছোট ছেলে, যাহারা এতক্ষণ মদের নেশার উত্তেজনার মত উত্তেজনায় হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া সে উত্তেজনাকে ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা এইবার ফাঁক পাইয়া আসিয়া ফিঙের অসাড় দেহের উপর লাথি মারিতে আরম্ভ করিল—শালা!

বয়স্কদের স্তিমিত উত্তেজনাও মুহূর্ত্তে আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহাদের একজন হাসিয়া বলিল—মার শালার মুখে লাথি! মার!

যাহারা প্রথম হইতেই চোর ধরার বীরত্বে লিপ্ত ছিল—তাহাদের উত্তেজনা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। একজন আরম্ভ করিল—সব শালা হুড় হুড় করে ছুটে পালাল। আমি গোড়া থেকে এই বেটার পিছু নিয়েছিলাম।

একটা কঠিন আক্ষেপে ফিঙে মুখ বিকৃত করিতেছিল, কিন্তু যন্ত্রণা আর তাহার নাই, সব ঘোলা হইয়া আসিতেছে! শুধু কালো কুয়াসার মধ্যে একটা যেন আলো জ্বলিতেছে। না—আলো নয়, ওটা তাহার মায়ের মুখ। হারামজাদী কাঁদিতেছে!

হাসপাতালে গিয়া ফিঙে মরিল।

চোরের মায়ের প্রকাশ্যে কাঁদিবার উপায় নাই বলিয়া একটি কথা আছে। কিন্তু সেটা ছেলে ধরা পড়িবার ভয়ে নিরুদ্দেশ হইলে বা ছেলে ধরা পড়িয়া জেলে গেলে। মরিলে কাঁদিবার বাধা নাই, কিন্তু ফিঙের মা কাঁদিল না, প্রকাশ্যেও না গোপনেও না। সে কাঁদিতে পারিল না। সে যেন হতভম্বের মত হইয়া গেল। যেমন কাজকর্ম করিয়া খাইত তেমনই করিয়া যায়। আপনার অবস্থাটা সে যেন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। ফিঙে মরিয়াছে! হ্যাঁ—কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর যে কম্পনে উত্তেজনায় বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ আবেগ জাগিয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়, চোখে জল আসে, বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিবার একটা সহজাত প্রেরণা জাগিয়া উঠে, সেই স্নায়ুমণ্ডলী তাহার যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

ফিঙের কথা কেহ বলিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার আর একটা বাতিক হইয়াছে, কাহারও ছেলে মরিলে ফিঙের মা সেখানে ছুটিয়া যাইবেই। সেখানে গিয়া সে উবু হইয়া একধারে বসিয়া সমস্ত দেখে। মায়ের কান্না দেখে, বুক চাপড়ানো দেখে, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অবশেষে মনিববাড়ীর কাজের সময় হইলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, যাই মা, মনিবে তো সুখ দুখ মানবে না! কিন্তু কান্না তাহার আসে না।

বৎসর খানেক পর।

মনিববাড়ীর কাজ সারিয়া ফিরিতেই শশী আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ভগবান আছে বই কি, শালা চৌধুরীর বেটা মরেছে, দশ বছরের বেটা!

ফিঙের মা কিছুক্ষণ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সে চলিল চৌধুরীর বাড়ীর দিকে। বাড়ীখানা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। ফিঙের মা পাশে পাশে গিয়া বারান্দায় শায়িত শবদেহের অল্পদূরেই উবু হইয়া গালে হাত দিয়া বসিল। চৌধুরীর স্ত্রী ছেলের বুকের উপর পড়িয়া আছে অসাড় নিস্পন্দ আর একটি শবদেহের মত!

সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফিঙের মায়ের চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল। আঃ, হায়-হায়, কি দুঃখ ওই মেয়েটির, কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ফিঙের মায়ের বুকের ভিতর একটা বিদ্যুতের মত শিখা এ' প্রান্ত হইতে ও' প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলিয়া গিয়া সব যেন পোড়াইয়া দিল। তাহার অসাড় স্নায়ুতে যেন নূতন চেতনা জাগিয়া উঠিল। ওই মেয়েটির প্রতি করুণায় তাহার বুক যেন ফাটিয়া গেল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাহার বুক মুখ ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতেই অকস্মাৎ সে উঠিয়া একরূপ ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। আপন বাড়ীতে নয়, একেবারে গ্রাম ছাড়িয়া নির্জন প্রান্তরে আসিয়া বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওরে বাবা আমার, ও মানিক রে!

ফিঙের জন্য নয়—ওই চৌধুরীর ছেলেটির জন্যই সে কাঁদিতেছিল। তাহার মধ্যে এতটুকু ছলনা ছিল না। হায়—ওই মা'টির কি বুক-পাষাণ-করা দুঃখ।

একে পটুয়ার মেয়ে—তার উপর বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা। ঠিক যেন জীর্ণ প্রাচীন সহকার-বিহারিণী আলোকলতা। জীর্ণ সহকারকে আপনার দেহজালের জটিল বেষ্টনে আচ্ছন্ন করিয়া যেমন আলোকলতার অগ্রভাগগুলি সাপিনীর মত আশপাশের সরস সহকারগুলির দিকে উদ্যত হইয়া নাচে, বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার তরুণী ভার্য্যা সরস্বতীও ঠিক তেমনি করিয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন নাচিয়া ফেরে।

গণপতি পটুয়া এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত গুণী। তাহার হাতের আঁকা পট সাহেব-সুবায় কিনিয়া লইয়া যায় ;—এমন নিখুঁত পটল-চেরা চোখ, ঠিক তিলফুলটির মত নাক, এমন মুঠিতে ধরা কোমর, এমন সুডৌল কলসীর মত বুক—এ আর কাহারও তুলিতে ফুটিয়া ওঠে না। গণপতি শুধু তুলির টানে পট আঁকিতে বা হাতের কৌশলে পুতুল-প্রতিমা গড়িতেই ওস্তাদ নয়, তাহার রচনা করা পটমাহাত্ম্যগান, দেবদেবীর নানা লীলার গানও বিখ্যাত। গণপতির গান নাকি গেজেটে ছাপা হইয়াছে ! 'দুর্গাঠাকরুণের শাঁখা পরা' 'শিবের মাছধরা' 'শিবের চাষ' 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ' প্রভৃতি অনেক পালাগানই সে রচনা করিয়াছে। এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনে-মানে-গুণে গণপতি শ্রেষ্ঠ লোক। বৃদ্ধ বয়সে সেই লোক, সরস্বতী পটুয়ানীকে দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। সরস্বতীর বাপ-মা গণপতির টাকা দেখিয়া অমত করিল না, অনেকগুলি টাকা দিয়া বুড়া সরস্বতীকে ঘরে আনিয়া তুলিল। বুড়ার কয়জন সম্পর্কিত নাতি নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া মুচিদের ডাকিয়া বাজনা বাজাইয়া দিল—ঢাক ও শিঙা ! বুড়া গণপতি কিন্তু অদ্ভুত লোক, সে ইহাতে রাগ করিল না, নাতিদের আদর করিয়া বসাইয়া পেট পুরিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া ছাড়িল।

কথাতেই আছে—"পটোনী আর নটোনী, চালচলনে এক ছন্দ, কে ভাল তার

কে মন্দ !” ‘পটোনী’ অর্থাৎ পটুয়ার মেয়ে, আর ‘নটোনী’ অর্থে নটিনী এ দুইই নাকি এক ; চলনে বলনে, রীতে করণে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, হাসিতে কাসিতে—ইহাদের পার্থক্য বিশেষ নাই ! যেটুকু আছে তাহাকে এপিঠ ওপিঠ বলিলেই চলে—নক্সীপাড় শাড়ীর সদর মফস্বলের মত। সরস্বতীও পটুয়ার মেয়ে, নববধূ হইয়াও সে মুখ বাঁকাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার ম্যাজেন্টার রঙমাখা ঠোঁটের অন্তরাল হইতে মিশিদেওয়া দাঁতগুলি সেই যে কলঙ্করেখার মত আত্মপ্রকাশ করিল, সে আর কোনদিন আত্মগোপন করিল না। সকলের উপর আশ্চর্য্য—তাহার ওই হাস্যকলঙ্কচিহ্নিত মুখের উপর কখনও দুঃখের কৃষ্ণপক্ষ নামিয়া আসে না ; চকিত অবগুণ্ঠনের লঘু মেঘেও কখনও সে মুখ ক্ষণিকের জন্য আবৃত হয় না।

বেলা দশটা বাজিতেই রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া পটুয়াদের মেয়েরা ব্যবসায়ে বাহির হয়। কাচের চুড়ি, মাটির পুতুল, পুঁতির মালা, কারঘুনসী, কাচপোকা, সোনাপোকা ডালায় সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি করিয়া বেচিতে যায়। রঙীন ছিটের খাটো কাঁচুলীধরনের জামার উপর মুসলমানী ঢঙে ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথায় ডালাটি তুলিয়া লয়। অভ্যাস এমনই হইয়া গিয়াছে যে, ডালাটা ধরিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না, দুখানি হাতই দিব্য দুলাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথেও তাহারা চলিয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া বেশ এক বিচিত্র সুরে হাঁকে—চাই রে-শমী চুড়ি—! সোহা—গি—নী ! নী—ল্ মা-নিক ! গুল্—বা-হা-র !

চুড়িগুলির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নাম-করণ উহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। হলুদ রঙের চুড়িগুলির নাম সোহাগিনী, গাঢ় সবুজগুলিকে বলে নীলমাণিক, গুল্‌বাহার চুড়ির রঙ গোলাপী। ঘোর লালের নামের বাহার সব চেয়ে বেশী—‘মন্‌চোরা’ !

পুতুলের নাম আছে—'কেশবতী', 'চম্পাবতী' 'কালিন্দী'। কেশবতীর মাথায় বেঢপ রকমের খোঁপা, চম্পাবতীর গায়ের রঙ হলুদ, নীলরঙের পুতুলের নাম কালিন্দী। মাথায় হাঁড়ি 'গোয়ালিনী', হাতে সাজি 'মালিনী', এ তো পুরানো নাম। এ ছাড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, লক্ষ্মীপেঁচা এসবও আছে। সরস্বতী নিজেই পুতুল গড়ে; গণপতি তাহাকে শখ করিয়া একাজ শিখাইয়াছে।

ফিরি করিয়া ব্যবসা করিতে গেলে মুখও দেখাইতে হয়, মুখরাও হইতে হয়, কিন্তু সরস্বতীর সবই স্বতন্ত্র; মুখের সঙ্গে মাথার কোঁকড়া চুলের খোঁপাটাও সে বাহির করিয়া রাখে, মিশি-দেওয়া দাঁতের হাসি তো কলঙ্করেখার মত দেখাই যায় এবং সে কলঙ্করেখা শুধু রূপেই বিকাশমান নয়, রবেও প্রকাশমান। সে রূপ ও রবের স্পর্শে তাহার জাতিসুলভ মুখরতা নটিনীর পায়ের নূপুরের মত উচ্ছল মাদকতাময় এবং নিঃসঙ্কোচ। হাটে সে লোককে ডাকিয়া জিনিস বিক্রী করে। মনিহারীর দোকানে যে যুবকটি সাবান কিনিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া সে হাসিয়া বলে—চুড়ি নেবে না—চুড়ি?

—চুড়ি! সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—চুড়ি?

—হ্যাঁ, চুড়ি। সোহাগিনী, নীলমাণিক, গুলবাহার, মনচোরা! কি লিবে দেখ!

সরস্বতীর মিশি দেওয়া দাঁত মৃদু হাসিতে ঈষৎ বাহির হইয়া কালো বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক হানে, লোকটি চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু সরিয়া যাইতে পারে না। সরস্বতী বলে—ব'স দেখ; কেমন রঙ বল তোমার বউয়ের, আমি পছন্দ ক'রে দি দেখ। আমার মত গোরা রঙ?

লোকটা একবার মুচকি হাসিয়া বলে—না!

—তবে? কচি কলাপাতার মত শ্যামলা? না, আরও কালো? কালো জামের মত ঘোর কালো?

শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সে ঘোর লাল রঙের 'মন্‌চোরা' রেশমী চুড়ি বিক্রী করিয়া ছাড়ে।

আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট-বড় তিন-চার রকমের স্থচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়ীতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয়, কস্তা দেয়—তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্থ। লতাপাতা, পাখি, ফুল, খেজুরছড়ি, বরফি কাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধূলার উপর আঙুল দিয়া নক্সা আঁকিতে শেখে, মুখস্থ করে। গৃহস্থ-বাড়ীর বউ ঝিয়েরা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া দূরে বসিয়া তাহাদের অবলীলায় চালিত স্থচের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, গ্রাম গ্রামান্তরের দশের বাড়ীর গল্প শোনে। মুখরা পটুয়ার মেয়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া স্থচ চালাইতে চালাইতে বলিয়া যায়, কোন্ গ্রামের কোন্ বাড়ীর বউয়ের নূতন চুড়ি হইয়াছে, সে চুড়ির প্যাটার্ন কি ; কাহার বাড়ীর বউয়ের হাতের চুড়ি হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে ; কোন্ বাড়ীর গিন্নীর কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্রের কোন্ শঙ্খের মত ; কোন্ বাড়ীর বধূর কথাগুলির ধার শাঁখের করাতের মত, ভাল, মন্দ দুই ধারাতেই না কাটিয়া ছাড়ে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতী ইহার উপরে বউদিদি দিদিমণিদের লইয়া ঠাট্টা তামাসা করে ; মুচকি মুচকি হাসিয়া ছড়া কাটে, কত নূতন লীলা-রঙ্গ শিখাইয়া যায়। তাহারা তাহাকে গণপতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেই—বাস্ আর রক্ষা থাকে না। মুখে কাপড় দিয়া লজ্জার ভাণ করিয়া সেই যে সে হাসিতে আরম্ভ করে সে হাসি আর তাহার শেষ হয় না। অবশেষে সে তাহার স্থচগুলি গুটাইয়া লইয়া বলে—আজ আর হবে

না দিদিঠাকরুণ, আজ চললাম, কাল আসব। দুষমনের হাড়ের দাঁত, ও আর আজ বারণ শুনবে নাই।

সরস্বতী চলিয়া গেলে, মেয়েরা কঠোর সংযমে শ্লীলতায় উগ্র হইয়া উঠে, সকলেই একবাক্যে বলে—সরস্বতীর মরণই ভাল! বৃদ্ধ হইলে কি হয়, সে তো স্বামী, তাহার নামে ওই হাসি!

সরস্বতীর হাসি কিন্তু তখনও থামে না, সে হয়তো পথ চলিতে চলিতে তখনও আপন মনে হাসে, অথবা বাড়ী ফিরিয়া চিত্রাঙ্কন-রত গণপতিকে হাসিতে হাসিতেই বলে—বাবুদের মেয়েরা কি বুলছিল জান?

পট হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গণপতি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করে—কি বুলছিল?

মুখে কাপড় দিয়া তাহারই দিকে আঙুল দেখাইয়া সরস্বতী বলে—তোমার কথা শুধাছিল।

হাতের তুলিটা একবার নামাইয়া রাখিয়া সকৌতুকে গণপতি প্রশ্ন করিল—কি শুধাছিল?

—বুলছিল—। খুব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া সরস্বতী আরম্ভ করিল—বুলছিল—। কিন্তু আর সে বলিতে পারিল না।

—কি বুলছিল?

একখানা কাচের বাসন যেন অকস্মাৎ সঙ্গীতময় ঝনাৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া সরস্বতী বলিল—শুধাছিল, বুড়াকে বিয়ে করলি কেনে?

কৌতুকহাস্যে গণপতির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু কি বুল্লি?

—বুল্লাম? বুল্লাম—বুড়া হ'লে কি হয় গো ঠাকরুণ, দাম যে বুড়ার লাখ টাকা। জান না, মরা হাতি লাখ টাকা? তা, ই তো মরা লয় বুড়া। গণপতি মানে গণেশ—আর গণেশের যে শুঁড় আছে গো!

গণপতি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বারবার ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিয়া বলিল—বড়ই বুলেছিস রে সরস্বতী—খুব বুলেছিস তু। বুড়া হাতী! গণপতি হ'ল গণেশের নাম! গণেশের মাথায় গজের মুণ্ডু! বাঃ।

সরস্বতীও পা ছড়াইয়া বসিয়া মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি হঠাৎ তুলি লইয়া সরস্বতীর ছড়ানো পা দুইখানির একখানি বাঁ হাতে ধরিয়া বলিল—তুলি দিয়া তোর পায়ে আলতা পরায়ে দি দেখ!

ক্ষণিকের জন্য সরস্বতীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; পরক্ষণেই সে মিশি দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, বলিল—ইহারা এলে বুলে দিব কিন্তু!

গণপতি কোন উত্তরই দিল না। ইহারা অর্থে পাড়ার নাতিসম্পর্কিত তরুণের দল। নিত্য সন্ধ্যায় তাহারা এখানে নামাজ পড়িতে আসে, নামাজ সারিয়া প্রহর-খানেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা আড্ডা জমাইয়া হৈ-চৈ করিয়া কাটায়। নাতি সকলে একদিক হইয়া সরস্বতীকে রহস্যবাণে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করে—সরস্বতী একা তাহাদের বাণ কাটিয়া তাহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। বুড়া গণপতি বসিয়া মৃদু মৃদু হাসে—প্রয়োজন হইলে মধ্যস্থতা করিয়া বিচার করিয়া দেয়।

পটুয়ারা ধর্ম্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচারে ব্যবহারে নামে পূরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দুর ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্যও খায় না। দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণ-কথার ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা-গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ইস্‌লাম! চাষবাসের বালাই নাই; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার—এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই। সেই বলিয়াই সরস্বতীর মত মেয়েরও তাহাদের সমাজে সাজা নাই, কিন্তু তাহাদের রসনা তো মানুষেরই রসনা—সুতরাং নিন্দা না থাকিয়া পারে না; সরস্বতীর নিন্দায় পটুয়া-পাড়া ভরিয়া উঠিল। কিন্তু দিগন্তের ওপারের বিদ্যুৎ-

চমকের মত কথাটার চকিত আভাস পাইলেও প্রাণঘাতী বিদ্যুৎ-শিখার সংস্পর্শ বা মেঘগর্জ্জনের ধ্বনি সরস্বতী ও গণপতির প্রত্যক্ষ গোচরে কোনও দিন আসিল না। একদা সে বিদ্যুৎ-শিখার উত্তাপ এবং গর্জ্জন প্রথম প্রত্যক্ষ করিল সরস্বতী। সে-দিন হাটের পথে সরস্বতীর সঙ্গিনী ছিল তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে, তাহার বাড়ীর সান্ধ্যমজলিসের নিয়মিত সভ্য এক নাতির পত্নী! পথে নির্জ্জন মাঠে ছুতা করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া মেয়েটি বিদ্যুৎশিখার মতই জ্বলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ চীৎকারে সরস্বতীকে বলিয়া দিল—কালামুখী, কলঙ্কিনী, গলায় দড়ি দি গা তুই, গলায় দড়ি দি গা!

সরস্বতী হাসিয়া আকুল হইল, বলিল, গলায় দড়ি দিব কি বুন, শাওড়া গাছের ডালে দড়ি বাঁধতি গিয়া ভূতের ভয় লাগে; মনে পড়ে যায় তোর বরকে!

সঙ্গিনী মেয়েটা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে সরস্বতীর সঙ্গ ছাড়িয়া বিপথে ভিন্ন গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

বাড়ী ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া সরস্বতী গণপতিকে বলিল—কি এনেছি দেখ!

গণপতি কৃষ্ণলীলার পট আঁকিতেছিল, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল—কি?

—এই দেখ! বলিয়া সে ডালা খুলিয়া দেখাইল।

—আরে বাপ! এত ধানী-লঙ্কা কি হবে রে?

—পাড়াতে বিলাব।

—কেনে?

সরস্বতী হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তারপর কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সকল কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলব, আমার হাতের গাছের লঙ্কা। লঙ্কা খেলে টিয়া পাখিতে খুব ভাল বুলি বলে। তোমরা খেয়ে দেখো, তোমরাও বুলি বুলবে ভাল!

গণপতি মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটে তাহার কৌতুকভরা

মৃদু হাসি। সরস্বতী বলিল—কি? কথা বলছ না যে? 'বুড়া হাতির মাথায় দিলাম ডাঙ্গসেরই বাড়ি'—না কি গো? বলিয়া সে আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি বলিল—তার চেয়ে চিটে-কাদমা দিলি না কেনে 'দুষ্টু সরস্বতী'? লোকের দাঁতে দাঁতে লেগে গিয়া আর খুলত না!

উঁহু! সরস্বতীর কথাটা পছন্দ হইল না।

কিছুক্ষণ পর গণপতি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ!

সে নূতন পটের নূতনতম অধ্যায়ের ছবিটি তাহাকে দেখাইল। যমুনার ঘাটে একটি মেয়ের মুখের কাছে আর একটি মেয়ে তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কৃষ্ণলীলার পটের মধ্যে এ ছবি কোনো কালে সরস্বতী দেখে নাই, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ই আবার কি হ'ল গো গুণিন?

গণপতি বাঁ-হাতে পটখানি তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীনির্দ্দেশে ছবি দেখাইয়া গাহিল—

> কুটিলার চসকু দুটি তারা হেন জ্বলে,
> দন্ত কিড়িমিড়ি করি রাধিকাকে বুলে।
> "কালামুখী কলঙ্কিনী রাই লো!
> তোর মতন কুল-মজানী গোকুলে আর নাই লো!"

সরস্বতী মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। বলিল—কুটিলের নাকটা কিন্তুক আর টুকচা তুলে দিতে হ'ত বাপু! এমনি—ক'রে!

বলিয়া সে নিজেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দেখাইয়া দিল! গণপতি হাসিল। সরস্বতী আবার মন দিয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। আবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত

করিয়া বলিল—কোন্ দোকানের রঙ আনছ বুল দেখি? সব রঙ কেমন মেটে মেটে খস্‌খসে লাগছে!

গণপতি বলিল—ধূলা পড়েছে রে, রঙের দোষ নাই। পথের ধারে ঘর—ফাগুন মাসের কাঁচা সড়ক—গাড়ীতে গাড়ীতে পথের ধূলা উড়ছে!

এ কথাতেও সরস্বতীর হাসি।

—তোমার মাথাটা কি হয়েছে গো! হি-হি-হি-হি! পাকা চুলের ডগায় ডগায় মেটে মেটে ধূলা—ঠিক কদম ফুল!

ওই মেয়েটির রাগের কারণ আছে। উহার স্বামী ঘনশ্যাম পটুয়াই গণপতির নাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন! ঘনশ্যাম রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, দু পয়সা উপার্জ্জনও করে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোটাকয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত—পট দেখাইয়া গান করিত, বিনা-পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালা গান করিত, প্রতিমা গড়িত, পুতুল গড়িত, রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত, যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না—তাহারা মাটির ঘর তৈয়ার করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল-রঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে—কাঠের উপর রঙ ও বার্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছে, এখান ওখান করিয়া বড়লোকের বাড়ীতে রঙের কাজ করে! শহর-বাজার হইতে সরস্বতীর পাতি জরদাটি সে নিয়মিত জোগাইয়া থাকে; রূপালী জরদা, কিমাম, কখনও বা আর দুই-চারিটা শখের জিনিসও আনিয়া দেয়।

ঘনশ্যাম তাহাকে বলে—রাঙাদিদি।

সরস্বতী মিশি-দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিয়া তাহাকে ডাকে—কেলোসোনা।

ঘনশ্যামের রঙ কালো। নামকরণ করিয়া দিয়াছে গণপতি নিজে।

সেদিন সরস্বতীর বিলানো ধানী লঙ্কার ঝাল গোটা পাড়ায় একটা জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। নাতিদের দল মুখ ভার করিয়াই আসিয়া বসিল। ঘনশ্যামের সমাদরটা সকলের মনেই এতদিন গোটা ধানী লঙ্কার মত সরস রহস্যের আবরণে জ্বালা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লুকানো ছিল। আজ সরস্বতীই সেগুলি ভাঙ্গিয়া ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘনশ্যামও আসিয়াছে। তাহার মনটাও ভাল নাই, তাহার স্ত্রী আজ তাহার সহিত চরম বচসা করিয়া ছাড়িয়াছে।

গণপতি নূতন পট দেখাইতেছিল। সরস্বতী রান্না করিতে করিতে অভ্যাসমত সরস রহস্যবাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের দল আজ তেমন সাড়া দিতেছে না। সরস্বতীর জলের অভাব হইয়াছিল, সে ঘড়াটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলোটা কেউ দেখাবে হে নাগরেরা ?

একজন বলিল—তোমার কেলেসোনা যাক।

—তাই এস হে, তুমিই এস ভাই।

ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল—যাবে তো কেলেসোনা, মজুরি কি দিবা গো রাঙাদিদি ?

দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া সরস্বতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল— মজুরি কিসের হে ? বেগার দিয়া কে কোন্ কালে মজুরি পায় ?

—উঁ—হু ! ঘনশ্যাম বেগার লয়।

—বেগার লয় ?

—না। উ হ'ল গিয়া কেলোসোনা ; কাল রঙের সোনা, সোনার পাথরবাটি, উ কেনে বেগার হবে ?

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তা বটে ! বুল হে কেলোসোনা কি লিবা মজুরি ?

ঘনশ্যাম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন বলিয়া উঠিল—

"সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীমতীকে পার করিতে লিব কানের সোনা !"

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—'তোমাকে রাঙাদিদি আর বুলব না ঠাকরুণদিদি—বুলব 'বিনোদিনী'। 'কেলোসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী'। তোমার নাম হ'ল 'বিনোদিনী'।

গণপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—তুমি বড় ভাল বুলেছ হে লাতি ; এ মজলিসে কল্কে তোমারই আগে পাওনা ! লাও কল্কে লাও।

হুঁকা সমেত কল্কেটি সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে উচ্ছল হিল্লোলে ঘাটের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে বাঁশী লাও হে কেলোসোনা, ঘাটের ধারে তুমি বাজাইবা—আমি জল ফেলব আর জল ভরব।

সরস্বতীর এই নির্লজ্জতায় সমস্ত নাতি-সম্প্রদায়ও আজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘনশ্যামের সহিত গোপন প্রেমের কথাটা এমন ঘোষণা করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রি রি করিয়া উঠিল। একজন গণপতিকে বলিল—তোমাকে আমরা খাতির করি—ভালবাসি ; কিন্তু তুমি এইবার গলায় দড়ি দিয়া মর ! ছি !

গণপতি উত্তরে নাতি-সম্প্রদায়কে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বুড়া বলিল—হ'ল না ভাই। তোমরা পাঁচের অনেক বেশী, আট জনা। পাঁচ হ'লি না হয়—বউয়ের নাম দিতাম দ্রৌপদী—তোমরা হতে পাণ্ডব।

কথা শেষ করিয়া বুড়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

নাতির দল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরবেই একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী ঘাট হইতে ফিরিল উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে। ঘনশ্যাম নীরবে

আলোটি নামাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গণপতি বলিল—বস হে কেলেসোনা!

ঘনশ্যাম ঢোক গিলিয়া বলিল—রাত অনেক—না—বসব না। বলিতে বলিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীর হাসি আরও বাড়িয়া গেল।

গণপতি কোন প্রশ্ন করিল না, সে তামাক সাজিতে বসিল। সরস্বতী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলে, তালাক দাও বুড়াকে, নিকা কর আমাকে!

গণপতি চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেও মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন হইতে নাতি-সম্প্রদায় গণপতির বাড়ীতে নামাজ পড়িতে আসা বন্ধ করিল; অপর এক প্রৌঢ় পটুয়ার বাড়ীতে তাহারা নামাজের আস্তানা গাড়িল। অভিরাম পটুয়া পয়সায় গণপতি অপেক্ষা কম নয়, সে ভাল রাজমিস্ত্রী, সৌখীন নক্সার কাজ সে ভালই করে। কিন্তু কুলকর্ম্মে রাজের কাজটা পটুয়া সম্প্রদায়ের নিকট কৌলীন্যজনক নয়। অভিরাম নামাজপ্রার্থীদের পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া খুশী হইয়া উঠিল। সে শুধু জল তামাকের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিল! ডুগি তবলা—মন্দিরা কিনিয়া পালা-গানের মহড়ার আড্ডাও খুলিয়া দিল অভিরাম।

কেবল ঘনশ্যাম আসা ছাড়িল না। এই লইয়া পটুয়াদের রমণী-সমাজ একেবারে শতমুখী হইয়া উঠিল। তাহারা সরস্বতীর সহিত এক সঙ্গে ব্যবসায়ে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু সরস্বতীর তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। চুড়ি-পুতুলের পসরা চাপাইয়া সে একাই গ্রামগ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিত। প্রতিবেশিনীদের মুখে মুখে তাহার কলঙ্ককাহিনী অঞ্চলময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ফলে হাটে তাহার পসরার সম্মুখে ভিড় জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল মধুমক্ষিকার ঝাঁকের মত।

নির্জ্জন পথে-প্রান্তরেও দুই একজন ক্রেতার পর্য্যন্ত অভাব হইত না। সরস্বতী সেইখানেই চুড়ি পুতুলের পসরা নামাইয়া বসিত। তাহার রাঙাদিদি নামটা পর্য্যন্ত সকলের জানা হইয়া গিয়াছে, ক্রেতারা হাসিয়া ডাকে—রাঙাদিদি!

সে বলে—কি লিবা লাও লাতি!

ঘনশ্যাম ইহাতে একদিন রাগ করিল—না রাঙাদিদি, ছি!

সরস্বতী কথায় জবাব দিল না, হাসিয়া সোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

ঘনশ্যাম আবার বলিল—হেসো না, ইটা হাসির কথা লয়!

পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে সে ভাঙিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুই দিন সে আসিল না পর্য্যন্ত। তৃতীয় দিনে সরস্বতী পসরা মাথায় করিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোপালপুরের পথ ধরিল। ওই গ্রামেই ঘনশ্যাম এখন জমিদারের পুরানো বাড়ীখানা নূতন করিয়া রঙ করিতেছে। বাবুরা নাকি শহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিবেন। গ্রামে কাহারও বাড়ী সরস্বতী যায় না, গেলে মেয়েরা তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তোলে।

প্রকাণ্ড বড় বড় থামওয়ালা জমিদারের সদর কাছারী; ফটকের দুই পাশে জমানো চুন-বালিতে গড়া দুইটা সিংহ। সরস্বতী ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাঁকিল—চা—ই, রে—শমী—চুড়ি—

হাঁক সে আর শেষ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল! কিন্তু সে হাসিতে তাহার অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়া গেল। জমিদারের কাছারী-বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া কুড়ি বাইশ বছরের সোনার বরণ যেন কোন্ রাজার ছেলে!

ঘনশ্যামও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া বার বার হাত ইসারা করিতেছিল—পালাও, পালাও!

সরস্বতীর তখন ঘনশ্যামের ইসারা দেখিবার ও বুঝিবার অবসর ছিল না, বিস্ময়-বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে সে ওই রাজার ছেলের দিকেই চাহিয়া ছিল!

ছেলেটি রাজারই ছেলে, জমিদারের বড় ছেলে; সম্প্রতি পড়াশুনার শেষ পরীক্ষা দিয়া গতকাল এখানে আসিয়াছে, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। ছেলেটি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি চাই?

—চুড়ি, রেশমী চুড়ি আছে, লিবেন?

ছেলেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি নিয়ে কি করব?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া গেল—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে উত্তর খুঁজিয়া পাইল, বলিল—বউরাণীর হাতে পরায়ে দিব।

—বউরাণী নেই। চুড়ির দরকার নেই।

—পুতুল, পুতুল লিবেন?

—তাই বা নিয়ে কি করব?

—টেবিলে সাজায়ে রাখবেন। সায়েবেরা লিয়া যায় আমাদের পুতুল।

—তাই নাকি? দেখি তোমার পুতুল!

সরস্বতী পসরা নামাইয়া বসিল, সম্ভ্রমভরেই বোধ করি, কিন্তু জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মাথায় সে ঘোমটা টানিয়া দিল। তারপর বাহির করিল মাটির পুতুল—কেশবতী, কঙ্কাবতী, মালিনী, গোয়ালিনী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ।

রাজার ছেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বাঃ! এ পুতুল তোমরা নিজেরা গড়?

—আজ্ঞা হ্যাঁ গো!

ঘোড়াটি তুলিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুণ জমিদার বলিল—এটা ঘোড়া নাকি?

—আজ্ঞা হ্যাঁ। পক্ষীরাজ ঘোড়া। পক্ষীরাজ আকাশে উড়ে কিনা! ই ঘোড়া তো লয়।

—ঠিক কথা। কত দাম নেবে বল তো?

সরস্বতী মুচকি হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল—ওরে বাপরে! দাম আমি বুলতে পারি,—না লিতে পারি! আপনি দিবেন বক্‌শিস। আপনারা হাত ঝাড়লে তাই আমাদের পর্ব্বত।

জমিদারের ছেলেটি একটি টাকা সরস্বতীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুতুলের দাম দু'পয়সা হিসাবে সাতটা পুতুলের জন্য চৌদ্দ পয়সার বেশী কেউ দিত না ; সে টাকাটা কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। টাকা বাঁধিয়াও সে উঠিল না, আবার আরম্ভ করিল—পট লিবেন না ? পট ?

—পট ?

—আজ্ঞা হাঁ, রামলীলা, কেষ্টলীলা, গৌরলীলা! সায়েবেরা কিনে লিয়ে যায় আজ্ঞা!

—ও! পট! তোমরা পট আঁক নাকি ? কিন্তু নতুন পট তো চলবে না, পুরনো পট চাই, আছে তোমাদের ?

—আজ্ঞা, আমার মরদ খুব পুরানো নোক, ষাট বছরের বুড়ো—তারই আঁকা পট আছে।

—তোমার মরদ—মানে তোমার স্বামী ? ষাট বছরের বুড়ো ?

—আজ্ঞা হাঁ গো। সরস্বতী মুখ হেঁট করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুক খুক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঘনশ্যাম আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনিতেছিল, সরস্বতীর চাপা হাসির শব্দে তাহার সর্ব্ব-অন্তর ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা—ই, রে—শমী চুড়ি—

জমিদার-বাড়ীর কাছারী ঘরের জানালায় রাজার ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল।—পট এনেছ ?

মাথার পসরা কাঁখে নামাইয়া—মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরস্বতী হাসিয়া বলিল—রাজার হুকুম, না এনে পারি ? বাপ রে!

—তবে ? রেশমী চুড়ি বলে হাঁকলে যে ?

—চাই—পট—বলতে কেমন লাগে যে। বলিয়া সে খালি হাতটায় কাপড় টানিয়া মুখে চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—কই, আন তোমার পট, এই ঘরেই নিয়ে এস।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পসরা নামাইয়া সরস্বতী বলিল—খুব ভাল পট এনেছি, গৌরলীলার পট।

—গৌরলীলার পট বুঝি খুব ভাল?

—গৌরলীলার পট আপনার লাগবে ভাল। গৌরচাঁদের মত বরণ আপনার, তেমুনি রূপ—

—বল কি!

—হ্যাঁ। আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। এই দেখেন—বলিয়া পট খুলিয়া সে সুরে আরম্ভ করিল—

সোনার গৌর যায় পথ আলো করি
যুবতীরা লাজে যায় মরমেতে মরি—
হায় রে এরে কেউ বাঁধতে লারে।

ত্রিশ টাকায় তিনখানা পট বিক্রী করিয়া সরস্বতী রঙ্গভরে বিপুল উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে ফিরিল। নোট তিনখানা গণপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—লাও, আমার গৌরচাঁদের কেমন দরাজ হাত দেখ। পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলেছি বাবুকে। রাগ করে নাই। বুললাম, আপনার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। তা মুখখানা হয়্যা উঠল সিন্দুরে মেঘের পারা।

গণপতিও হাসিল—আজ কিন্তু তাহার হাসি ম্লান। সে বলিল—কিন্তুক গৌর-প্রেম ইয়ারা যে সইবে না বুলছে। মেয়েগুলান তো শাঁখের মত গলা বার করেছে। কেলোসোনা তোমার ধুয়া তুলেছে—মলে ফেলব না।

সরস্বতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—বাবারে—তবে তো ভয়ে আমি মরে গেলাম। ভেবো নাই তুমি, তুমার আগে আমি মরব। তুমি আবার একটা নিকা করবে—টুকটুকে—চম্পাবতীর পারা বরণ।

গণপতি হাসিয়া বলিল—না রে রাঙাবউ, দেহ আমার ভাল নাই।

সরস্বতী হাসিল—বিষণ্ণ হাসি, বলিল—সেও তুমি ভেবো নাই।

গণপতি আর কিছু বলিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চাই রেশমী চুড়ি!

গণপতি মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু সরস্বতীর চোখে তাহা পড়ে নাই। গণপতির শরীর ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনদশেক পরেই একদিন সরস্বতী ওই গোপালপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তুলি হাতে করিয়াই অর্দ্ধসমাপ্ত পটের সম্মুখে গণপতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা দুর্দ্দমনীয় কম্পনে থর থর করিয়া সে বসিয়া পড়িল।

গণপতি মরিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতে যে আশঙ্কা করিয়াছিল সে আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল! তাহার নাতির দল ছুটিয়া না আসিয়া পারিল না। কিন্তু একটি মেয়েও আসিল না সরস্বতীকে সান্ত্বনা দিতে।

গণপতির সৎকার শেষে নাতিরা আসিয়া বহুদিন পরে আবার রাঙাদিদির দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া তবে বাড়ী গেল।

দিন তিনেক পরে।

ঘনশ্যাম সকালেই আসিয়া দাওয়ায় বসিল—কই কি হচ্ছে গো?

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—এস লাগর এস।

বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যাম বলিল—কি বুলছ বুল, এইবার?

মুখে কাপড় চাপা দিয়া সরস্বতী বলিল—কিসের গো?

—নিকার কথা। কি বুলছ বুল দেখি?

—উঁ—হু। সতীন নিয়া ঘর করতি লারব আমি!

—উকে যদি তালাক দি?

—হুঁ—তবে করব নিকা।

—দেখিয়ো!

—হুঁ গো! আমার কেলোসোনার দিব্যি। হ'ল তো?

—কিন্তু তুমি এমন ক'রে বেড়াতে পাবে নাই।

—বেশ!

কথায় কিন্তু বাধা পড়িল; নাতি-সম্প্রদায়ের অন্যতম নাতি দ্বিজপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—কই? রাঙাদিদি কই?

—এস, এস, ভাই এস। সরস্বতী হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঘনশ্যাম উঠিয়া গেল। দ্বিজপদ বসিয়া বলিল—তারপরে?

হাসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। হা নটে তুই—

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজপদ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ—

—কেনে—ধ্যেৎ কেনে?

—বুড়া দাদু তো গেলো, তুমি কি করবে—শুধাতে এলাম—তা—না—

—বুড়া মরেছে—আমি নেকা করব।

—হুঁ—তা—

—উঁ—হু। সতীন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে, তুমি উঠে যাও।

—আমি যদি তালাক দিই?

—তখন এস; পিঁড়ি পেতে রাখব আমি। এখন উঠ—আমি যাব গোপালপুর, জমিদারবাবুর পুতুলের বরাত আছে।

সে ডালা সাজাইয়া দুয়ারে তালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তালা দিতে গিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। বুড়া ওই ঠাঁইটিতে বসিয়া ছবি আঁকিত। তালাচাবীর অভ্যাস তাহার নাই।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা—ই, রেশমী চুড়ি!

কিন্তু জমিদার-বাড়ীর জানালা আজ খুলিয়া গেল না। কোথাও এতটুকু শব্দ হইল না, বাতায়ন-পথগুলি সবুজরঙের কপাটে ভাঁজ মিলাইয়া নীরন্ধ্র রুদ্ধ!

গৌরচাঁদ চলিয়া গিয়াছে।

পটুয়াপাড়ার প্রায় প্রতিঘরেই একটা অবরুদ্ধ কান্না গুমরিয়া মরিতেছিল। তরুণী বধূগুলি গোপনে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও কান্নার কথা জানে না। তাহাদের স্বামীরা তাহাদিগকে তালাক দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—সরস্বতী না মরিয়াও তাহাদিগকে রেহাই দিল।

সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—সরস্বতী নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নাতিরা সকলেই পরস্পরের সন্ধানে চাহিয়া পরস্পরকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল; তাহারা সকলেই আছে—সে-ই নাই।

সকলেই ছুটিল—তালাকের আর্জ্জি ফিরাইয়া আনিতে। মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া গালিগালাজে শতমুখী হইয়া উঠিল।

সরস্বতী বলিয়া তাহাকে কেহ চেনে না। শহরে রাঙাদিদির চুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকান বিখ্যাত।

পাকা আমের মত গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া রাঙাদিদির খরিদ্দারেরা নিত্য তাহার জিনিস কেনে। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েরা নিত্য পুতুল ও চুড়ি ভাঙে, নিত্য কেনে।

—কি চাই ভাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া? কালকেরটা রাক্ষসে খেয়ে নিয়েছে?

—কি দিদি—আজ কি পরবে? মনচোরা না নীলমাণিক?

লোকে বলে, বুড়ী পটুয়ানীর অগাধ পয়সা।

মেলা

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে নয়, কোন্ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহা-প্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ্য।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাঁকের পয়সাও না।

সিউড়ীর ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারশো টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার দুশো টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে! প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি; রঙীন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেত পাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়ীমুড়কী চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিকে যাওয়া আসা করিতে ছিল।

তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জম্‌জমাট—দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশো চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভাল হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হ্যাঁ, গোটা বিশ-পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খপ্‌সুরৎ।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কম্‌লি আর পট্‌লি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ! ফেশান কি তাদের। টেরীবাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে।… কি চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে সুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস্‌ কত টাকায় ডাক হ'ল জানো?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এঁ্যা? ডাইস্‌? দেড় হাজার।

—কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগার বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুট-ফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বন্‌বন্‌ শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙ্গুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এস খুকী এস। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর ফর শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্ত্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কত দাম?

—কিসের? পুতুল না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোন্‌টা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিয়া লইল। পর মুহূর্ত্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব্‌, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—"রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হ'ল না।"

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দুপাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসের লোভে সংকীর্ত্তনের পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী!

সংকীর্ত্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল—না বাপু, আমাদের কাছে দুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল—এস ভাই দাদা চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চেখে দেখুন আগে, ভাল না হয় দাম দেবেন না আপনি!

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন? বাসি? ফল কি কখনও বাসি হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল—চাখ্‌না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বল্লেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকা-বাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বল্লেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ী বলতে যেয়ো না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে ত। খবরদার!

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে···লাগিয়ে দিই।

জুতার পটীর পথের দুপাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটির অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোড়ালী-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর দল কিন্তু নাছোড়বান্দা। অমর যত আগাইয়া চলে দুপাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু! দিন না বাবু! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ী থেকে—

অর্দ্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু ছুঁয়ো না তুমি অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই ? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে ব'লে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ী যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি ?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয় বাজী দেখিগে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখ্‌মলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভাল চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে ত তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে, নয় দাদা ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল—

—শাঁক আলু, পালং শীষ !

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত ক'রে ভাই ?

—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাব্‌লা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছো একটি কাঁচের কেসে কেমিকেলের গয়না লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্ন শ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—

তিন পাথরের আংটী একটি ক'রে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা! বেশী নয় চার পয়সা ক'রে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটী দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল—বসো দাদা, বসো।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিয়াছিল—চার হাত কার দু'পয়সা, বড় বড় কার দু'পয়সা, রকম রকম দু'পয়সা—জামাই-বাঁধা কার দু'পয়সা। টান্‌লে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না······দু-দু পয়সা, দু-দু পয়সা।

পটিটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলরোল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিবেগ দুইদিকে চলিয়াছিল। একদিকে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজীর ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা ?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া বড় চারিটি ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড়-

ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালী, খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গেছে।

এইটাই আনন্দ-বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্ততঃ পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহূর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইখানে তারপর ওই দরজায়, আবার আর একটা দরজায়······মোট কথা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্য্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডায় উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়াখেলা চলিতেছে। কোন্ ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরের জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্ব্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহূর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায় শব্দ হইল—ওয়াক—ওয়াক!

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাসা নারীর দেহ।

বমির উপর বসিয়াই মেয়েটা গান ধরিয়া দিল—

'মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব!'

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো।

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনমোহিনী খিলি বাবু, মনমোহিনী খিলি। যে যে-বয়সে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—'পান খেয়ে যাও হে বঁধু,—'

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল—দেখেছিস্?

অপরজন কহিল—এর চেয়েও ভাল আছে। তার নাম কমলি। ফড়িং বল্লে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম তোমার?

মেয়েটি বলিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী। বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন-শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পরা হয় না নাগর। গোটা গোটা।

একজন কহিল—মদ খাবে ত!

—খাওয়ায় কে? বলি বকে বকে মুখ তেত হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর!—

একটা ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্ব্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কম্‌লি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালবাসবি না তুই। তোর নামে আমি নালিশ করব। ডিফামেশন স্যুট!

মেয়েটি কহিল,—যা যা যাঃ আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্নেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিষ্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্নেসী হয়ে!

বাজীর ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজী-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোস পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোশাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত, দাদা ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলো বড় বড় চামচিকার মত ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজী।"

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সব চেয়ে ভাল বাজীটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রং-এর তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এসো ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান···।' তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—কি, ইউ ডাব্‌ল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

—ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মত দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার কোকলা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটা মুণ্ডু অফ বোম্বাই।' এক পাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরাজী বাজনা বাজছে। আয়, আয়! ওদিকে বড় বড় বাজী আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্দ্ধমগ্ন কুটার কত। বাজীর তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জল আলো জলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিং-এর খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চলো, চলো, দো-দো পয়সা! দো-দো পয়সা!

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক।

—হাঁ—হাঁ। ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচেন কি ?

—কি ভাবচেন মশা ? ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। ওই দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে !

তাঁবুর সম্মুখের পর্দ্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রং-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্ত্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম্, রকম্ রকম্ দেখবেন। ভিতর যান, ভিতর যান।

ক'জন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, হাতী—হাতী !

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্য্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোকরা !

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারি পাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি ?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁস হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারি পাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝক্‌মক্ করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল। মণি ! কোথায় মণি !

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় যে আসিয়া পড়িল কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে ছ'টাকা, ছ'টাকায় চার টাকা !

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ ? অমর দেখিল আঠারো-উনিশ বছরের একটি খদ্দর পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপী।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুণে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু'ঘুঁটিতে চার গুণ, তিনঘুঁটিতে ছ'গুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এস আমার সঙ্গে এস। কি, হয়েছে কি তোমার? পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীব্‌কে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই ধর। ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ী কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ' বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না টয়না আছে না কি?

—হাতে দুগাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনী বাঁধা আছে!

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্ত্তা দুই-চারিটা শুধু স্পষ্ট ভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায় সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজীকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল

তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই! থাক্ সে বাহিরে দাঁড়াইয়া! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দু'পায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কুকুরে ডিগবাজী খায়, বাঁদরে ঘোড়ায় চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোড়ে! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দ্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা ত নাই! কয়েক মুহূর্ত্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি দুষ্টু তাহার দাদাটা!

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে!

পথে একটা দোকানে দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এসো ভাই, চলে এসো। কাবাব রুটী। গোস্ পরেটা! চিংড়ী-কাঁকড়া,—এই এই, ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো!

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল—এই বড়ো বাঘ!

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্ত্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল—এই সরো'ই বটে রে বাবা—গাড়ী আসছে, গাড়ী আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের

মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দ্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্ গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াসার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে। মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক' ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকার পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ওপাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে সে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশালাই জ্বালিয়া সে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল; মণির ফুট্‌ফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া

আসিল। মণিরও ভয়ার্ত্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী ?

তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না !

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি ? তুমি কেঁদ না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে।

—হোক্ না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো !

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—ব'স ত মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

কে একজন কহিল—পূজো করব বলে।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ। কমল !

কমল কহিল—অনেক নরকের দোর ত' খোলা রয়েছে, যাও না। আমি পারব না।

—একবার শোনই না !

কম্‌লি কহিল—বেশী উপদ্রব করলে পুলিস ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কম্‌লি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদ না খুকী, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম ত' খুকী নয়, আমার নাম মণি—

—মণি। তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি ব'লে ডাকব ?

কম্‌লি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন ?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—।

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্য্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানীটার কথা পর্য্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগর-দোলা, পুতুল দুটি কত ভাল তাহাও সে বলিল। মখ্‌মলের চটিও কেমন তা'ও অপ্রকাশ রহিল না।

কম্‌লি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক ত মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ !

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ড রূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কম্‌লি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি।

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উঁ।

কম্‌লি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলা কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই! নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভাল। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমল সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কম্‌লি কহিল—তোমার মা ভাল, না আমি ভাল!

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভাল, তুমিও ভাল।

কম্‌লি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী! মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল—তুমি শোও।

হাসিয়া কম্‌লি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কম্‌লি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কম্‌লি!

কম্‌লি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কম্‌লি কহিল—মাসী !

আগন্তুক মেয়েটি কহিল—হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস্ যে ? কি হয়েছে তোর ? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুণ্‌তে হবে।

কম্‌লি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো ? কার মেয়ে ?

কম্‌লির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি ? কোথায় পেলি ?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে ?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কম্‌লি জবাব দিল—না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভাল ক'রে আগড়টা সরিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কম্‌লি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই একটা উচ্চ, জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজী, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গেছে।

কম্‌লি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কম্‌লি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর এক মুহূর্ত্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেল্‌নাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ডাইনীর বাঁশী

গ্রীষ্মকালের ভোরবেলা। রাধানগরের বেনেদের মেয়ে স্বর্ণ স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এক হাতে একটা জলভর্ত্তি ঘটী, অপর হাতে কর গুণিয়া ইষ্ট-দেবতার নাম করিতেছিল। বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া শুনিল কে তাহাকে ডাকিতেছে—"ক'নে ক'নে—ও রাঙাক'নে!"

ইষ্টস্মরণ স্বর্ণের আর হইল না। হাসিতে হাসিতে বাড়ী ঢুকিয়া সে কহিল—"কেন গো আমার টুকুমণি—টুক্‌টুকে বর?"

বরটি নেহাতই শিশু, কিন্তু টুক্‌টুকে তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌরবর্ণ ফুট্‌ফুটে বছর পাঁচেকের ছেলেটি স্বর্ণের মুখপানে চাহিয়া কহিল—আমায় পেয়ারা দাও ক'নে! পেয়ারা দেব বলেছিলে যে।"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল—"ও হরি! বরের টান আমার পেয়ারার ওপর। আমি বলি বর আমার ক'নের টানে ভোরবেলা পালিয়ে এসেছে।"

এত কথা শিশু বুঝিল না। ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া সে স্বর্ণের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

ঘরের দরজা খুলিয়া স্বর্ণ দুটি পাকা পেয়ারা আনিয়া টুকুকে দেখাইল। সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া টুকু কহিল—"দা—ও।"

—"আগে চুমু দাও।"

টুকু গাল পাতিয়া দিল। গভীর আবেশে টুকুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্বর্ণ চুমায় চুমায় ছোট মুখখানি ভরিয়া দিল। তার পর আপন ভিজা আঁচলে টুকুর সদ্য-ঘুম-ভাঙা ভারী-ভারী মুখখানি মুছাইয়া দিয়া কহিল—"কি রীত তরিবৎ তোমার মায়ের! চাঁদের মত মুখখানি, হয়ে আছে দেখ দেখি! যেন পাঁশকুড়!

ছি—ছি—ছি! আ-চ্ছা—এইবার বস ত' বর। ব'সে ব'সে তুমি পেয়ারা খাও, আমি কাপড় ছেড়ে ফেলি।"

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া টুকুমণি পেয়ারা খাইতে বসিল।

স্বর্ণ কাপড় ছাড়িয়া তরকারীর ডালা সাজাইতে আরম্ভ করিল। পিতৃ-মাতৃহীনা বিধবা মেয়েটির এই জীবিকা। যখনকার যা' নূতন সব্জী তাই সে গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে বেচিয়া বেড়ায়। এ বৃত্তিটি স্বর্ণের পৈতৃক। বেনে বুড়া এই করিয়া জীবন কাটাইয়া গেছে। মাতৃহীনা ছোট্ট স্বর্ণকে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে রাখিয়া সে গ্রাম-গ্রামান্তরে বাড়ী বাড়ী সব্জী বেচিয়া আসিত। বেনে বুড়ার আদরও ছিল খুব। স্বর্ণের সে সুবিধাটুকু নাই—সে বাড়ী বাড়ী যাইতে পারে না। লোকে দশ কথা বলে। স্বর্ণর মা না কি লোক ভাল ছিল না। মাকে স্বর্ণর মনে পড়ে না। বছর পাঁচেক বয়সে স্বর্ণর মা মারা গিয়াছে।

দশ কথা শোনার অপেক্ষা হাটে যাওয়াই সে পছন্দ করে। কত সময় সে বলে—"আমার আবার মান-মর্য্যাদা! ভগবানই যার মান রাখলেন না, তার মান কি মানুষে রাখতে পারে? না—রাখতে গেলে থাকে? পাঁচ বছরে যার মা যায়, এগার বছরে যে বিধবা হয়, আঠারো বছরে যার বাপ মরে,—তার আবার মর্য্যাদা!"

আজ সাউ-গাঁয়ের হাট। ক্রোশ চারেক রাস্তা যাইতে হইবে। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি ডালা সাজাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দরজায় তালা দিয়া স্বর্ণ কহিল—"এস বর।"

বর ক'নের আঙুল ধরিয়া বকিতে বকিতে চলিল—"আমায় কি কি গয়না দেবে ক'নে?

হাসিয়া স্বর্ণ কহিল—"কনে বুঝি বরকে গয়না দেয়? বরই ক'নেকে গয়না দেয়। ক'নে গয়না পরে, বর বেটাছেলে গয়না পরে না।"

টুকু ঘাড় নাড়িয়া প্রবল আপত্তি করিয়া উঠিল—"না—আমি তবে বর হ'ব না। ক'নে হ'ব।"

পরম তৃপ্তি ও কৌতুকে স্বর্ণ হাসিয়া উঠিল।

—"মাসী!"

পথের পাশের বাড়ীটির দরজা হইতে একটি তরুণী বধূ উঁকি মারিয়া কহিল—"মাসী!"

এদিক ওদিক চাহিয়া স্বর্ণ দাঁড়াইল, কহিল—"কি—গো বৌমা?"

বধূটিও একবার এদিকে ওদিকে দেখিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। চকিতের মধ্যে একটি সিকি সে স্বর্ণের ডালায় ফেলিয়া দিয়া কহিল—"নেবুর নিমকী, আর খোট্টাই আমসত্ত।"

পরমাদরে স্বর্ণ চুপি চুপি কহিল—"খোকা হবে না কি মা?"

ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বধূটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তরুণীদের সঙ্গে এমন গোপন কারবার স্বর্ণের ছিল। তাহাদের সাধ-আহ্লাদের সামগ্রী স্বর্ণ গোপনে জোগাইত। দশের দশ কথার জ্বালার মধ্যে এইটুকুই ছিল তাহার পরম সান্ত্বনা।

পথের একটা বাঁক ফিরিয়াই গাঙ্গুলীদের বাড়ী। বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া গাঙ্গুলী বাড়ীর মেজ ছেলে হরিধন পড়িতেছিল—"অস্তি গোদাবরী তীরে—"

স্বর্ণকে দেখিয়া সরস্বতীকে গোদাবরী-তীরে বিসর্জ্জন দিয়া সে কহিল—"ভারি বজ্জাৎ তুই স্বন্ন পিসী!"

ম্লান হাসি হাসিয়া স্বর্ণ কহিল—"পাই নি বাবা।"

ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হরিধনের একটা কুপথ্যের বরাত ছিল। নানা অজুহাতে স্বর্ণ সেটি এড়াইয়া চলিতেছিল।

হরিধন অভিমান করিয়া পড়ায় মন দিল—"বিশাল—বিশাল শাল্মলী তরু—। অস্তি গোদাবরী তীরে—।"

সুযোগ বুঝিয়া স্বর্ণ গাঙ্গুলীদের বাড়ী পিছনে ফেলিল। আরও কয়খানা বাড়ী

অতিক্রম করিয়া টুকুদের বাড়ী। বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া স্বর্ণ টুকুকে কহিল—"যাও বর, বাড়ী যাও।"

টুকু তাহার আঙ্গুল টানিয়া কহিল—"তুই আয় ক'নে।"

একটা বেদনার ছায়া স্বর্ণের মুখে ঘনাইয়া আসিল, সে কহিল—"না—যাও তুমি। আমাকে দেখলে মা মারবে।"

টুকু মিনতি করিল—"তোর পায়ে পড়ি—।"

স্বর্ণ ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ী ঢুকিল।

টুকুর মাতামহী সৈরভী উঠান নিকাইতেছিল; সে তাহাদের দেখিয়া কহিল—"ওরে দস্যি ছেলে, ভোরবেলা উঠে ক'নের বাড়ী পালিয়েছ তুমি? তোর মা আবার খুঁজতে গেল।"

সৈরভীকে দেখিয়া স্বর্ণের মুখে হাসি ফুটিল। সৈরভী তাহার পাতানো দিদি! সেই সম্পর্কেই দৌহিত্র টুকু তাহার বর।

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল—"বৌ ঘরে না থাকলে ছেলে কি ঘরে থাকে দিদি? আমায় ঘরে নিয়ে এস—নাতি ঘরে থাকবে। আমাকে খেতে না দিলে আর উপায় নাই।"

স্মিতমুখে সৈরভী হাসিতে লাগিল।

টুকু সঙ্গে সঙ্গে হাতের পেয়ারাটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল—"আমি খেতে দি; —খা ক'নে।"

স্বর্ণ অতি আদরে টুকুর চুমা খাইয়া কহিল—"ওরে আমার টুকুমণি! আমার টুকটুকে বর!"

সৈরভী কহিল—"না স্বন্ন, তুই বাপু নাত্তির নাম খারাপ ক'রে দিলি। কত সাধ ক'রে আমি নাম রাখলাম গৌরবরণ; তুই ক'রে দিলি টুকু। এখন কেউ বলছে টুকী, টাকী, টুক্‌টাক্, টুকো, টোকা। না বাপু!"

—"গৌরবরণ নাম ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ীতে বলবে, দিদি। ও আমাদের টুকুমণি টুকটুকে বর।"

তার পর বেলার দিকে চাহিয়া কহিল—"আসি দিদি আমি। আজ আবার সাউ-গাঁয়ে হাট। বস ভাই বর। আর একটি চুমু দাও ত'। বাঁশী—বাঁশী আনব আজ।"

টুকু গাল পাতিয়া দিল, কিন্তু স্বর্ণের আর চুমা খাওয়া হইল না। সম্মুখেই ওদিকে খিড়কীর দরজায় টুকুর মা মানু দাঁড়াইল। সে শশব্যস্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথে দাঁড়াইয়া সে মানুর তীব্রকণ্ঠ শুনিতে পাইল।

মানু বলিতেছে—"মুখপোড়া দস্যি, আবার তুমি স্বন্নর বাড়ী গিয়েছিলে? বারবার বারণ করি না হতভাগা, যাস্‌নে ডাইনীর বাড়ী!"

টুকু কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণ বুঝিল মা ছেলেকে প্রহার করিতেছে।

সৈরভীর গলা শোনা গেল—"মারিস নে বলছি মানু, মারিস নে! আর তোর মুখের কি থাঁতা-ফাতা নাই, যা ইচ্ছে তাই লোককে বলবি?"

মানু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"যা ইচ্ছে তাই বৈ কি? ওর মা ডাইনী ছিল না?"

সৈরভী কহিল—"মা ছিল তা ওর সঙ্গে কি?"

মানু কহিল—"ওর সঙ্গে কি? নিম গাছে নিম ফলই হয় মা, চিনির ডেলা ধরে না।"

স্বর্ণের মায়ের এই ডাইনী অপবাদ লইয়াই লোকে দশ কথা বলে স্বর্ণ শুনিয়া ম্লান হাসি হাসে! আজও সেই ম্লান হাসি সে হাসিল। তার পর সাউগাঁয়ের পথে অগ্রসর হইল।

অপরাহ্ণ বেলায় স্বর্ণ হাট হইতে ফিরিতেছিল। মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের বনরেখা সবুজ পটের মত মনে হয়। সে সবুজ বর্ণ এখন হইয়া উঠিয়াছে ধূসর ধূমাচ্ছন্ন। মাঠখানা তখন হইয়াছিল তপ্ত আগুন। বাতাস এত লঘু ও তপ্ত যে নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছিল। উত্তাপ নিবারণের

জন্য ভিজা গামছাখানি পাট করিয়া স্বর্ণের মাথায় চাপানো। কিন্তু পা যেন আর চলিতেছিল না। দারুণ উত্তাপের মধ্যে চলিতে আজ তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল।

জগতে দুঃখ-দুর্দ্দশার পথে চলিতে কষ্ট বোধ বড় তাহার হয় না। জীবনে ওটা যেন সহ্য হইয়া গেছে। বহু বৈশাখী দ্বিপ্রহরে সে এই প্রান্তরটা অতিক্রম করিয়াছে। বড় শাঁক আলুটা গাঙ্গুলীদের খোকাকে কোন্ গোপনীয় স্থানে দিতে হইবে তাহারই হিসাব তখন তাহার মনের মধ্যে ঘুরিত ফিরিত। কখনও ভাবিত বাসনমাজার ঘাটে তাম্বুলবিহারের কৌটাটি সরকারদের ছোট বৌকে দেওয়াই বোধ হয় সব চেয়ে নিরাপদ হইবে!—আর ঘোষেদের মেয়েকে স্নানের ঘাটেই পাকা আম ক'টি দিলে চলিবে! এই হিসাব-নিকাশের মধ্যে কখন কামারমাঠের বটগাছটা আসিয়া পড়িত। কিন্তু আজ যেন দেহ তাহার বেশ ভাল নাই। মনের মধ্যে কোন প্রত্যাশী হাসিমুখ উঁকি মারে না।

এত বড় বিস্তীর্ণ মাঠখানার মধ্যে একটা গাছও নাই যে ছায়ার তলে মানুষ দাঁড়াইয়া একটু বিশ্রাম লয়। ভিজা গামছাখানা বারবার স্বর্ণ মুখে চোখে বুলাইয়া লইতেছিল।

চলিতে চলিতে নিজের উপরেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই রৌদ্রের মধ্যে বাহির না হইলেই ত হইত! পরের ছেলেমেয়ের উপর সত্যই এত মায়া কেন তাহার?

আর মা যখন তাহার···।

স্বর্ণ শিহরিয়া উঠিল।

মায়ের সে প্রবৃত্তি তাহার বুকের মধ্যে যদি থাকে! সে যদি সহসা জাগিয়াই উঠে!

স্বর্ণের বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় কেমন করিয়া উঠিল।

কোথা হইতে একটা ছায়া ছুটিয়া আসিয়া মাথার উপরে দাঁড়াইল। আবার ছায়াটা আগাইয়া গেল। স্বর্ণ পিছন ফিরিয়া দেখিল পশ্চিম আকাশে কয়টুকরা

কালো মেঘ উঠিয়াছে। ধূমপুঞ্জের মত সেগুলা পরিধিতে ক্রমশঃ ফুলিয়া ফুলিয়া বাড়িতেছে। হয় তো কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিবে। স্বর্ণ গতি দ্রুততর করিল। আচ্ছা, আজই যদি এখনি সে ডাইনী হইয়া যায়!

স্বর্ণের গতি আচম্বিতে রুদ্ধ হইয়া গেল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারি পাশে চাহিয়া দেখিল। না—কোন পরিবর্ত্তন ত হয় নাই! নিশ্চিন্ত হইয়া সে আবার চলিল।

বুড়া বটগাছটা আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

সহসা একটা তীব্র আলোকে পৃথিবী ভয়ে যেন নীল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল রবে বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

স্বর্ণ আর একবার পিছন পানে চাহিল। সেই কয়টুকরা মেঘ ইহারই মধ্যে পশ্চিমাকাশ ছাইয়া মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরের আকাশ হইতে সঞ্চরমান বিন্দুর মত শকুনগুলা পাক খাইতে খাইতে নামিয়া আসিতেছে।

পশ্চিমের দিগন্ত সুনিবিড় পিঙ্গল বর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। স্বর্ণ বুঝিল ঝড় উঠিয়াছে। সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

গাছটার তলে পৌছিতে পৌছিতে স্বর্ণ যেন একটা আবর্ত্তের মধ্যে ডুবিয়া গেল। বুড়া গাছটা সে আবর্ত্তের আন্দোলনে যেন মাথা আছড়াইয়া মরিতে চাহিল।

ধূলায় দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গেছে! সভয়ে স্বর্ণ হাতের ইসারায় গাছটার সুবিশাল কাণ্ডটা জড়াইয়া ধরিতে চাহিল। কিন্তু হোঁচট খাইয়া সেই খানেই পড়িয়া গেল।

কোনরূপে সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি অনেক। জল ঝড় থামিয়া গেছে। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে।

সমস্ত রাত্রিটা চৈতন্যহীনার মত পড়িয়া ছিল। কিন্তু অভ্যাসমত ভোরবেলাতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিতে গিয়া সে অনুভব করিল সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। দুর্ব্বলতায় পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অবসন্ন দেহে দাওয়ার উপর বেচারা বসিয়া পড়িল।

—"পিসী, কাল সারারাত এমন ধারা তুমি কাত্‌রেছ কেন গো ?"

স্বর্ণ মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহারই প্রতিবেশী সাউদের মেয়ে শৈল। শৈলর কথাগুলা স্বর্ণের মাথার মধ্যে বোধ হয় গেল না ; সে শুধু কহিল—"শৈল ?"

শৈল আবার প্রশ্ন করিল—"কাল সারারাত তুমি চেঁচিয়েছ কেন বল ত ?"

বিস্মিতের মত স্বর্ণ কহিল—"আমি ?"

কাঁধের গামছাটা মাথায় চাপাইয়া শৈল কহিল—"হ্যাঁ গো তুমি। সে কি গোঙানী বাপু! মা মা ব'লে চীৎকার। আমি বলি, কি হ'ল রে বাপু।"

স্বর্ণ স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মাথাটা কেমন করিতেছিল, সে স্মরণ করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কহিল—"হবে। জলে ঝড়ে ভিজে শরীর ভাল নাই মা, জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে। মাথা ঘুরছে।"

শৈল কহিল—"তাই হবে। আজ আর চান-টান ক'র না যেন। তোমার দোক্তা আছে পিসী ? আমার দোক্তা ফুরিয়েছে।"

—"দেখ দেখি মা কুলঙ্গীর ওপর কৌটোটা—।"

দোক্তা পাওয়া গেল। শৈল কহিল—"নেবে না কি পিসী ?"

—"নাঃ—থাক, ভাল লাগছে না।"

ঠোঁটের গোড়ায় দোক্তা পুরিতে পুরিতে শৈল কহিল—"জান পিসী, মুখুজ্জেদের বৌটির বড় ব্যায়রাম বাপু।"

স্বর্ণ সবিস্ময়ে কহিল—"সে কি শৈল, কাল যে বেশ ভাল ছিল। আমি যখন যাই তখন যে দেখলাম আমি।"

—"কাল সন্ধ্যে থেকে ব্যামো। সে ঝড়ের সময় প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে গোঙাচ্ছে। কে জানে বাবু ভূতেটুতে পেলে না কি ?"

শৈল চলিয়া গেল।

স্বর্ণ কিন্তু স্থির থাকিতে পারিল না। সে আঁচলের তলে আমসত্ত্ব আর নিমকী লইয়া মুখুজ্জেদের বাড়ী গিয়া উঠিল।

অজ্ঞান অবস্থায় বউটি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। যন্ত্রণার যেন তার অবধি নাই। অসম্বৃত বস্ত্রের মধ্যে সে দেখিল গর্ভদেশ তাহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

—"কে গো? রোগীর ঘরের মধ্যে কেন? সরে এসো ওখান থেকে।"

মুখুজ্জে-গিন্নী পিছন হইতে কথা কয়টা বলিলেন, স্বর্ণকে তিনি চিনিয়া ছিলেন।

স্বর্ণ অপ্রতিভের মত ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"যাই মা; বলি একবার দেখে যাই।"

গিন্নী মুখ ভার করিয়া কহিলেন—"না—ডাক্তারের বারণ আছে।"

স্বর্ণ চলিয়া আসিল। কিন্তু একেবারে গেল না। পথে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পিছনে কে কি বলে অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া শোনাটা যেন তাহার রোগে দাঁড়াইয়াছে। মুখুজ্জে-গিন্নীর কণ্ঠস্বর সে শুনিতেও পাইল—"কে জানে ওরই কীর্তি কিনা? বৌমাকে বলি যে কাঁচা বয়স।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বর্ণ টুকুদের বাড়ী গিয়া উঠিল।

সৈরভী মুড়ি ভাজিতেছিল, কহিল—"আয় স্বন্ন আয়। তোর না কি অসুখ? শৈল বলছিল।"

ওদিকের দাওয়ায় মানদা ও শৈল গল্প করিতেছিল। স্বর্ণ মানদাকে দেখিয়া শঙ্কিত হইল। তবু সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাওয়াটা অশোভন হইবে ভাবিয়া বসিয়া কহিল—"হ্যাঁ দিদি, কাল জলে ঝড়ে ভিজে শরীর ভাল নাই। জ্বরও একটু হয়েছে, মাথাও কেমন করছে।"

—"শুয়ে থাকলি নে কেন? একটু ঘুমুলে শরীরটা সোজা হ'ত!"

—"তাই যাব। মুখুজ্জেদের বাড়ী গিয়েছিলাম ওদের বৌটিকে দেখতে। আহা বৌটি বড় ভাল। কাল আমাকে নিমকী আর আমসত্ত্ব আনতে দিয়েছিল।"

সে অঞ্চলতল হইতে জিনিস দুইটি বাহির করিয়া দেখাইল।

সৈরভী কহিল—"কাঁচা বৌ, পড়ে গিয়ে এমন হ'ল। কে জানে—অপদেবতা টেবতা।"

ঘাড় নাড়িয়া স্বর্ণ কহিল—"না—দিদি।"

—"হরে বোরেগী ত তাই বলছে ভাই। ও আবার মন্তর-তন্তর কিছু কিছু জানে ত!"

—"উঁহু—যাই বলুক হ'রে বোরেগী, ও সব কিছু নয়। পড়ে গিয়ে পেটের ছেলে ম'রে গিয়েছে। আমার বেশ মনে হ'ল।"

শৈল দাওয়া হইতে কহিল—"মুখুজ্জে-বৌ কি পোয়াতী না কি? কই ওদের গিন্নিও ত কিছু জানে না।"

স্বর্ণ অপ্রস্তুতের মত কহিল—"পোয়াতী বটে!"

মানদা কহিল—"মাসী কি ডাইনী না কি? তাই পোয়াতীর পেটের ভেতর মরা ছেলে সব দেখতে পেলে?"

স্বর্ণ বিস্মিত একাগ্র দৃষ্টিতে মানদার পানে চাহিল।

গামছাখানায় কপালের ঘাম মুছিয়া সৈরভী মেয়েকে কি ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু মানদা নিবৃত্ত হইল না, কহিল—"আমার শ্বশুরবাড়ীতে এক ডাইনী ছিল—শুনেছি, সে নাকি সব দেখতে পেতো। মানুষের বুকের ভেতর প্রাণ নড়ছে, শিরার মধ্যে রক্ত চলছে; পোয়াতীর পেটের ভেতর ছেলে, গাছের ফুলের মধ্যে ফল—সব সে দেখতে পেতো।"

সৈরভীর লজ্জা হইল। সে বিরক্তিভরে কহিল—"কি যে বলিস মানদা তুই?"

দৃঢ়স্বরে মানদা কহিল—"ঠিক কথা বলছি। ওদের মত অনিষ্টকারী পৃথিবীতে আর নাই। কত জীব যে ওরা নষ্ট করে তার ঠিক নাই। ফলন্ত গাছ, পোয়াতী, শিশুছেলে এদের ওপর রাক্ষসীদের ভারি লোভ। মানুষের শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে নেয়।"

শৈল কহিল—"তোর সবই বাড়াবাড়ি। চুষে না কি খেয়ে নেয়।"

—"তোদের ত সব তাতেই অবিশ্বেস। শোন্ না সেই মাগীর কথা। সে মাগী কত যে এমন অনিষ্ট ক'রেছে তার ঠিক নাই। রাত্রে আবার চীৎকার করতো আর বাট বয়ে বয়ে বেড়াতো। শেষে মলো ত মরবার সময় একটা পোষা বেরালকে বিদ্যে দিয়ে গেল। কিছুদিন পর হঠাৎ বেরালটা ডাইনী হয়ে উঠল।"

স্বর্ণের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। দাওয়ার খুঁটাটা ধরিয়া কোনমতে উঠিয়া কহিল—"আমি যাই দিদি, শরীরটা কেমন করছে।"

সৈরভী মিষ্টস্বরে কহিল—"আমি সঙ্গে যাব স্বন্ন ?"

—"না—আমি একাই যেতে পারব দিদি।"

—"তোর বরের বাঁশী এনেছিস স্বন্ন ? বাঁশী বাঁশী ক'রে ত আমায় ছিঁড়ে খেলে।"

—"এনেছি দিদি, কিন্তু সঙ্গে ত নিয়ে আসি নি।"

সৈরভী হাসিয়া কহিল—"ক'নে ভুল্‌লেও বরের ভুল হবে না। পাঠশাল থেকে আসুক ত—ঠিক গিয়ে হাজির হবে। সে আবার আজ পাঠশাল গিয়েছে।"

স্বর্ণ চলিয়া গেল।

মানদা মাকে কহিল—"কেন মা, তুমি এমন আস্কারা দিচ্ছ ? যেদিন টুকুর মাথা খাবে, সেইদিন বুঝবে। মুখুজ্জে-বৌকেও ওরই নজর দেওয়া—দেখো তুমি।"

স্বর্ণ আসিয়া ঘরের দরজায় ঠেস দিয়া বসিয়া যেন হাঁপাইতেছিল। বৈশাখের দ্বিপ্রহর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। জলন্ত সূর্য্যপ্রভায় যেন জ্বালা করিতেছে। জন-বিরল পথঘাট। পাখী পর্য্যন্ত ডাকে না। শুধু 'ইঁদ' পুকুরের পাড়ে তালগাছের মাথায় একটা চিল তীক্ষ্ণ কম্পিত একঘেয়ে ডাক ডাকিয়াই চলিয়াছে।

সমস্ত পল্লীখানা যেন থম্ থম্ করিতেছিল। একটা তীব্র অবসন্নতায় স্বর্ণের চেতনা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মানদার কথাগুলা ক্রমাগত তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল। ডাইনী—সে ডাইনী।

শিশু, গর্ভিণী এদের উপর তার বড় লোভ! মায়ের প্রবৃত্তি কখন হয়ত অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিবে। হয়ত বা উঠিয়াছে! মুখুজ্জেদের বৌকে···।

স্বর্ণের শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসে। সে নড়িয়া চড়িয়া বসে।

ডাইনীরা সব দেখিতে পায়। গর্ভিণীর গর্ভের ভ্রূণ, গাছের মুকুলের ফল,—দেহের মধ্যে রক্ত, মাংস, হৃৎপিণ্ড, প্রাণ-স্পন্দন—সব তাহারা দেখিতে পায়!

ক্ষণে ক্ষণে শরীর তাহার শিহরিয়া উঠে! চিলটার চীৎকার তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে অতি তীব্রভাবে আঘাত করিতেছিল। বিরক্ত হইয়া তালগাছের মাথার পানে চাহিল।

স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল। ও কি? তালগাছটার উদ্গমোন্মুখ ফলভার যেন সে দেখিতে পাইতেছে! ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া আবার সে চাহিল। সত্যসত্যই ত সে তালগাছটির ভাবী ফলসম্ভারের সূচনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে!

—"ক'নে, ও ক'নে!"

টুকু আসিয়া স্বর্ণের গলা জড়াইয়া ধরিল। প্রখর রৌদ্রে গৌরবর্ণ মুখচোখ তাহার রাঙা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

—"আমি পালিয়ে এসেছি ক'নে। মা ঘুমিয়েছে। আর আমি চুপি চুপি উঠে—" কৌতুকে টুকু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্বর্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে টুকুকে দেখিতেছিল।

টুকু তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল—"রাগ করেছিস্ ক'নে? কথা কইবি না? চুমু, চুমু খাবি না?"

স্বর্ণের চোখ দিয়া হু হু করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে গভীর আবেগে টুকুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"ওরে আমি না কি ডাইনী,—ডাইনী!

ছেলে ভালবাসি আমি, পোয়াতী ভালবাসি আমি। কি সব মিথ্যে কথা বলে এরা ?”

দুই হাতে কর্ণমূল ধরিয়া টুকুর রৌদ্রে রক্তরাঙা মুখখানি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। কিন্তু চুমু আর খাওয়া হইল না। সে যেন কেমন হইয়া গেল। একবার তালগাছটার মাথার পানে চাহিয়া আবার সে টুকুর মুখপানে চাহিল।

টুকু কহিল—“চুমু খা ক'নে। বাঁশী দে।”

স্বর্ণ তাহাকে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল—“পালা পালা—টুকু ; পালিয়ে যা তুই—পালিয়ে যা।”

টুকু তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, কহিল—“বাঁশী দে ক'নে, বাঁশী দে।”

টুকুর ননীর মত দেহখানি স্বর্ণ আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। কঠিন ভাবে পেষণ করিয়া তাহার আশ মিটিতেছিল না। যেন সে সুকোমল শিশুদেহখানি আপনার বুকের মধ্যে পুরিয়া লইতে চায়।

পেষণে ভয় পাইয়া টুকু কাঁদিয়া ফেলিল, মিনতি করিয়া কহিল—“আমায় ছেড়ে দে ক'নে ছেড়ে দে! তুই এমন করছিস কেন ? না—না, এমন ক'রে চাপিস্‌নে তুই ক'নে !”

স্বর্ণ যেন উন্মত্ত হইয়া গেছে। সে কহিল—“আমি ডাইনী, আমি কি করব ? আমার সামনে এলি কেন, এলি কেন তুই ? এই যে তোর দেহের লাল রক্ত আমি দেখতে পাচ্ছি।”

একটা অধীর লোলুপতায় টুকুর মুখে সে একটা সুদীর্ঘ চুম্বন করিল। রুদ্ধশ্বাসে শিশু যত আক্ষেপ করে, সে তত সবলে মুখের উপর মুখ চাপিয়া ধরে।

শিশুটির আক্ষেপ ক্ষীণ হইয়া যেন এলাইয়া আসিল।

স্বর্ণের যেন চমক ভাঙিল। সে টুকুকে ছাড়িয়া দিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

সভয়ে চারিদিক একবার সে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ প্রখর দ্বিপ্রহর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। তালগাছের মাথায় এখনও সেই চিলটা তেমনি তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর ডাক ডাকিয়া চলিয়াছে।

টুকুর শিথিল দেহখানি সে সভয়ে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। অতি ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস এখনও বহিতেছে। আশ্বস্তা হইয়া স্বর্ণ মুখে চোখে শীতল জলের অভিসিঞ্চন দিল।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষায় টুকু ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। স্বর্ণ মুখের উপর ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"টুকু!"

টুকু ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শুশ্রূষায় টুকু আর একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। স্বর্ণ চারিদিক চাহিয়া টুকুকে কোলে লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

রৌদ্রতপ্ত জনহীন পথ বাহিয়া সে টুকুদের বাড়ীর দরজায় টুকুকে নামাইয়া দিয়া যেন চোরের মত পলাইয়া আসিল।

টুকু ডাকিল—"ক'নে!"

স্বর্ণ পিছন ফিরিয়া চাহিল না; ছুটিয়া আসিয়াই আপন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন সে তৃষ্ণাতুর কুকুরের মতই হাঁপাইতেছিল।

রাক্ষসী মায়ের বুকের সেই অজগরটা তাহার বুকের মধ্যে সহসা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।

ঘরখানা যেন ঘুরিতেছিল—কোনরূপে গতরাত্রির বিশৃঙ্খল শয্যার উপর সে লুটাইয়া পড়িল।

তার পর প্রবল কম্পে, দেহের বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায় তাহার চেতনা লুপ্ত হইয়া গেল।

যখন তাহার বেশ চেতনা হইল তখন প্রায় সন্ধ্যাবেলা,—পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চব্বিশটি ঘণ্টা যে কেমন করিয়া তাহার কাটিয়া গেল সে নিজেও তাহা জানে না।

জানেন এক অন্তর্য্যামী সর্ব্বদর্শী। ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া বিছানার উপর বসিয়া সে ধুঁকিতেছিল। মনের মধ্যে গত দিনের দ্বিপ্রহরের ঘটনাগুলা যেন আবছায়ার মত ঘুরিতে ফিরিতে ছিল।

কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাই কি হয়?

পাশেই শৈলদের বাড়ী, সে একবার ডাকিল—"শৈল! অ—শৈল।"

কেহ সাড়া দিল না। স্বর্ণও আর ডাকিল না।

ডাকিতে যেন তাহার ভয় হইতেছিল।

সত্যই যদি তাই হয়! শৈল যদি সেই কথাই বলে!

সন্ধ্যা হইয়া আসে।

শৈলর উচ্চকণ্ঠ এক সময় শোনা গেল—"দাদা—অ—দাদা—সকাল সকাল খেয়ে নাও বাপু।"

শৈলর দাদা যতীন প্রশ্ন করিল—"কেন রে বাপু, এত তাড়া কেন?"

—"আমাকে আবার মানুদের বাড়ী যেতে হবে। মানুর ছেলেটির কাল রাত্রি থেকে বড় জ্বর।"

—"আচ্ছা যাই। কিন্তু বাপু তুই আবার জ্বর ধরাস নে। ডেঙো—না ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কি হচ্ছে।"

—"ডেঙো না তোমার মাথা। এ ঐ মাগীর কাজ। তোমরা বাপু এর একটা বিহিত কর। গাঁয়ে ডাইনী হ'লে ত রক্ষে থাকবে না।"

—"কে রে বাপু?"

—"কেন ওই যে পাশেই বাড়ী। টুকু ত জ্বরের ঘোরে নামও করছে ওর।"

স্বর্ণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আপন অন্তরের মধ্যটা যেন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে চাহে। হ্যাঁ—অন্ধকারের মধ্যে ত সে বেশ দেখিতে পাইতেছে। টুকুর দেহের রক্তাভা—দেহের মধ্যে রক্ত সে ত বেশ দেখিতে পাইয়াছিল। তালগাছের সেই উদ্গমোন্মুখ ফলভারও সে ত' দেখিয়াছে। শক্ত

করিয়া মাটি ধরিয়া সে পাথরের মত বসিয়া রহিল। বুকের মধ্যে সদ্যজাগ্রত অজগরটা যেন ক্ষণে ক্ষণে ফোঁসাইয়া ফোঁসাইয়া উঠিতেছে!

রাত্রি তখন কত কে জানে, তবে শুক্লা ষষ্ঠীর চাঁদ সবে অস্ত গিয়াছে। দিগন্তরায়িত চন্দ্রের আভায় চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে একটি পাণ্ডুরতা! স্বর্ণ সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহির হইল। পথে নামিয়া সতর্ক পদক্ষেপে টুকুদের বাড়ীর কানাচে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশের বুক ক্রমশঃ প্রগাঢ় নীল হইয়া উঠিতেছে।

স্বর্ণ কান পাতিয়া ছিল।

সহসা সৈরভীর গলা শোনা গেল—"টুকু, টুকু! মানদা আলোটা বাড়িয়ে দে ত'। টুকু এমন করছে কেন?"

মুক্ত জানালা দিয়া আলোকরশ্মি অশ্বত্থ গাছটার মধ্যভাগে গিয়া পড়িল। স্বর্ণ আরও দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

সৈরভীর গলা আবার শোনা গেল—"তাই ত রে মানদা, টুকুর জ্বরটা যে খুব বেড়েছে মনে হচ্ছে।"

মানদা কহিল—"এ কিচ্ছু নয় মা, ঐ মাগীর কাণ্ড। এ তুমি দেখো।"

সৈরভী ডাকিল—"টুকু—টুকু—টুকু ভাই!"

—"আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ক'নে।"

টুকু বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল।

মানদা কহিল—"শুনছিস্ মা, শুনছিস্ আমার কপালে কি আছে—মা গো!"

সৈরভী কহিল—"নিতু ডাক্তার ত বল্লে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা না কি!···"

মানদা সে কথায় কান দিল না, সে ডাকিল—"টুকু—টুকু রে!"

টুকু বকিতেছিল—"আমি ডাইনী, আমি কি করব? আমার সামনে এলি কেন তুই?"

স্বর্ণের পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে ধীরে ধীরে কোনরূপে বাড়ী আসিয়া উঠিল।

বিছানায় শুইয়া সোয়াস্তি হয় না, বসিয়া সে থাকিতে পারে না, অস্থিরের মত সে ঘরখানার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা ঝরিয়া বক্ষবাস সিক্ত হইতেছিল। অতি মৃদুস্বরে সে আক্ষেপ করিতেছিল—"টুকু, টুকুমণি—টুকু বর!

মানদার একটা কথা সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"ডাইনী রাত্রে চীৎকার করে আর ঘরময় বাট ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায়।"

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়া সবলে বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিল।

আবার কতক্ষণ পর নিশীথ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া রোদনধ্বনিতে পল্লীখানি চকিত হইয়া উঠিল।

স্বর্ণের বুকখানা ধড়ফড় করিয়া উঠিল!

সে দরজা খুলিয়া দাওয়ার উপরে দাঁড়াইল। সম্মুখের প্রাচীরঘেরার ওপাশে পল্লীপথ। পথে ক্রমশঃ লোকের সাড়া জাগিয়া উঠে।

কে কহিল—"কি, ব্যাপার কি হে গোবিন্দ?"

গোবিন্দ কহিল—"এই যে তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম। মুখুজ্জেদের বউটি মারা গেল হে।"

—"কি রকম?"

—"মৃত সন্তান প্রসব ক'রে।"

—"হঠাৎ?"

—"কাল ঝড়ের সময় পড়ে গিয়েছিল। কেউ বলছে তাই—কেউ বলছে—"

—"কি বলছে কেউ?"

—"এই নাম করছে—স্বর্ণ হে। মুখুজ্জে-গিন্নী বলছে—ওরই কাজ।"

—"তা হ'লে ত বড় বিপদ হ'ল।"

—"আবার এখুনি ওদের বাড়ীতে শুনলাম—পালেদের টুকুকেও না কি দৃষ্টি দিয়েছে।"

এ লোক-কটির সাড়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। আবার লোক যায়। কেহ আসে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ পথ আবার নিস্তব্ধ হইয়া উঠে। শুধু মুখুজ্জেদের বাড়ীর শোকার্ত্ত ক্রন্দনধ্বনি মর্ম্মান্তিক হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বর্ণ অন্ধকারে আপন অঙ্গনে অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা আপন মনেই কহিল—"আমি কি করব? এল কেন—এল কেন আমার সামনে?"

আবার পদচারণা করিতে করিতে উর্দ্ধমুখে অন্ধকার আকাশপানে চাহিয়া হা হা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। হাসি কি কান্না বোঝা যায় না।

ওদিকে শোকার্ত্ত পরিবারটির বিলাপমুখর কণ্ঠ ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। কখনও কখনও একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। ইঁদু পুকুরের ওপারে সহসা শব্দ উঠিল ঠক্ ঠক্ ঠক্। শবযাত্রার জন্য বাঁশ কাটা হইতেছে। দূরে পথচারী কুকুর একটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্বর্ণ চমকিয়া গভীর অভিনিবেশে কান পাতিয়া শোনে মানদার কণ্ঠ নয়—কুকুরের চীৎকার।

ভোরের আকাশে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

স্বর্ণ ক্লান্ত হইয়া বিছানায় গিয়া গড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথার মধ্যে একটা আগুনের শিখা যেন দপ্ দপ্ করিতেছিল। স্বর্ণ অচেতনের মত অভিভূত হইয়া পড়িল।

যখন আবার তাহার চেতনা হইল তখন সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। দীর্ঘ বিশ্রামের পর শরীরটা যেন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। দুইটা মুড়ি মুখে দিয়া স্বর্ণ দাওয়ার উপরে আসিয়া বসিল।

প্রাচীরের ওপারে পথে পদশব্দে স্বর্ণ অনুভব করে পথচারী যায় আসে।

কলরবের মধ্যে কোন কথা বেশ বোঝা যায় না। সে কয়বার বাহিরের প্রাচীরের গায়ে আসিয়া কান পাতিয়া কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যেন হতাশ হইয়াই বারবার ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সময়ের পাথায় ভর দিয়া রাত্রি অগ্রসর হইয়া চলে। ক্রমশঃ গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তমীর চাঁদ ডুবিয়া গেল।

বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে স্বর্ণ দরজা খুলিয়া কখন পথে নামিল। আজও আবার সে টুকুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

পথে মুখুজ্জেদের দুয়ারের সম্মুখে স্বর্ণ একবার দাঁড়াইল। একটা কান্নার আবেগে বুকখানা তাহার মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কানের পাশে বাজিতেছিল, মিষ্ট মৃদু ডাক একটা—"মাসী!"

চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল চকিত নীরব হাসিটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বর্ণ অগ্রসর হইল। আবার আজ টুকুদের বাড়ীর সেই কানাচে গিয়া দাঁড়াইল।

টুকু কাঁদিতেছিল—"না—এখুনি—।"

সৈরভী কহিল—"সকাল হ'ক বাঁশী কিনে দেব।"

টুকু কাঁদিল—"না—ক'নের বাঁশী, কনের বাড়ী যাব আমি।"

মানদা রূঢ়কণ্ঠে কহিল—"রাক্ষসীর নাম করবি ত খুন ক'রে ফেলব। ক'নে—ওর সাতপুরুষের ক'নে। তোমার মাথা যে খেতে বসেছিল সে হতভাগী! ভাগ্যে খোঁড়া গুণীন ছিল—তাই বাঁচলি।"

স্বর্ণ আর দাঁড়াইল না। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আপন দুয়ার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রভাতে উঠিয়া আপন ডালাটি লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া ডালাটি রাখিয়া দিল। শুধু একটি কি অঞ্চলতলে লুকাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পাশ দিয়া পথিক চলিয়া যায়; গৃহদ্বারে লোকে কথা কয়, স্বর্ণ কাহাকেও চিনিতে পারে না। চোখ তাহার মাটী হইতে উঠিতেছিল না। টুকুদের দুয়ারে আসিয়া সে দাঁড়াইল। কয় মুহূর্ত্ত পরে সে আবার চলিল। কিছুদূর গিয়া আবার সে ফিরিল। আবার টুকুদের দুয়ারে দাঁড়াইল।

সাহস করিয়া এবার চকিতের জন্য সে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল। তার পর অঞ্চলতল হইতে বাহির করিল একটি বাঁশী।

দরজার পাশেই টুকুর খেলাঘর।

স্বর্ণ হাত বাড়াইয়া বাঁশীটি সেই দিকে ফেলিয়া দিয়া নত চোখে আবার পথ ধরিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বসিয়া স্বর্ণ আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল, আর রাক্ষসী মাকে তাহার অভিসম্পাত দিতেছিল।

সত্যই তাহার বুকের মধ্যে জর্জ্জর-লোলুপ একটা ক্ষুধা হিংস্র অজগরের মত অনিবার লক্ লক্ করিতেছে। টুকুকে আবার তেমনি করিয়া বুকে চাপিয়া চুম্বন করিতে চিত্ত তাহার উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিতেছে। কি সুন্দর—কি কোমল টুকু?

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের উদাসীনতা ভাঙিয়া দূরে পথের বাঁকে একটি মিষ্টধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পি—পি—পিউ—পিউ।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ার খুলিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ধ্বনিটি অগ্রসর হইয়া আসে! কিন্তু স্বর্ণ আবার ঘরের মধ্যে গিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরের দুয়ারে আসিয়া ধ্বনিটি থামিল।

স্বর্ণ বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর দুয়ারের ও-পাশে বাঁশীটি পথে পথে বাজিতে বাজিতে দূরে চলিয়া গেল।

কলরবের মধ্যে কোন কথা বেশ বোঝা যায় না। সে কয়বার বাহিরের প্রাচীরের গায়ে আসিয়া কান পাতিয়া কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যেন হতাশ হইয়াই বারবার ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সময়ের পাখায় ভর দিয়া রাত্রি অগ্রসর হইয়া চলে। ক্রমশঃ গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তমীর চাঁদ ডুবিয়া গেল।

বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে স্বর্ণ দরজা খুলিয়া কখন পথে নামিল। আজও আবার সে টুকুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

পথে মুখুজ্জেদের দুয়ারের সম্মুখে স্বর্ণ একবার দাঁড়াইল। একটা কান্নার আবেগে বুকখানা তাহার মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কানের পাশে বাজিতেছিল, মিষ্ট মৃদু ডাক একটা—"মাসী!"

চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল চকিত নীরব হাসিটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বর্ণ অগ্রসর হইল। আবার আজ টুকুদের বাড়ীর সেই কানাচে গিয়া দাঁড়াইল।

টুকু কাঁদিতেছিল—"না—এখুনি—।"

সৈরভী কহিল—"সকাল হ'ক বাঁশী কিনে দেব।"

টুকু কাঁদিল—"না—ক'নের বাঁশী, কনের বাড়ী যাব আমি।"

মানদা রূঢ়কণ্ঠে কহিল—"রাক্ষসীর নাম করবি ত খুন ক'রে ফেলব। ক'নে—ওঁর সাতপুরুষের ক'নে। তোমার মাথা যে খেতে বসেছিল সে হতভাগী! ভাগ্যে থোঁড়া গুণীন ছিল—তাই বাঁচলি।"

স্বর্ণ আর দাঁড়াইল না। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আপন দুয়ার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রভাতে উঠিয়া আপন ডালাটি লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া ডালাটি রাখিয়া দিল। শুধু একটি কি অঞ্চলতলে লুকাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পাশ দিয়া পথিক চলিয়া যায় : গৃহদ্বারে লোকে কথা কয়, স্বর্ণ কাহাকেও চিনিতে পারে না। চোখ তাহার মাটী হইতে উঠিতেছিল না। টুকুদের দুয়ারে আসিয়া সে দাঁড়াইল। কয় মুহূর্ত্ত পরে সে আবার চলিল। কিছুদূর গিয়া আবার সে ফিরিল। আবার টুকুদের দুয়ারে দাঁড়াইল।

সাহস করিয়া এবার চকিতের জন্য সে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল। তার পর অঞ্চলতল হইতে বাহির করিল একটি বাঁশী।

দরজার পাশেই টুকুর খেলাঘর।

স্বর্ণ হাত বাড়াইয়া বাঁশীটি সেই দিকে ফেলিয়া দিয়া নত চোখে আবার পথ ধরিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বসিয়া স্বর্ণ আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল, আর রাক্ষসী মাকে তাহার অভিসম্পাত দিতেছিল।

সত্যই তাহার বুকের মধ্যে জর্জ্জর-লোলুপ একটা ক্ষুধা হিংস্র অজগরের মত অনিবার লক্ লক্ করিতেছে। টুকুকে আবার তেমনি করিয়া বুকে চাপিয়া চুম্বন করিতে চিত্ত তাহার উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিতেছে। কি সুন্দর—কি কোমল টুকু ?

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের উদাসীনতা ভাঙিয়া দূরে পথের বাঁকে একটি মিষ্টধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পিঁ—পিঁ—পিউ—পিউ।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ার খুলিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ধ্বনিটি অগ্রসর হইয়া আসে ! কিন্তু স্বর্ণ আবার ঘরের মধ্যে গিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরের দুয়ারে আসিয়া ধ্বনিটি থামিল।

স্বর্ণ বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর দুয়ারের ও-পাশে বাঁশীটি পথে পথে বাজিতে বাজিতে দূরে চলিয়া গেল।

রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলোটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে-ছাওয়া বাংলোটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস্। বাংলো দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। 'পিট' গুলার মুখে, বয়লারগুলোর চিমনীর মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে ওখানে কুলিদের কেরোসিনের কুপী খদ্যোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলি-রিক্রুটার চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা মিছে কথা……সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তা নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন ত চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার রেজিষ্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতে-ছিল। সম্মুখে গম্ভীর ভাবে আর একজন বসিয়া আছে স্থাণুর মত—চোখের পলক পর্য্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতে ছিলেন—"এখানে ৺বৃষ্টি খুবই হইয়াছে। ওখানে ৺বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। চাষ-আবাদের অবস্থা বুঝিয়া ধান্যগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।"

আর একখানা ঘরে লটারির টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্ক বাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। আট আনা করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার

টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া সারা হইয়া গেল। হেডক্লার্ক বাবু কলম ধরিয়া বসিয়া ছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে বল হে কালীপদ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না।··· দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি?

একেবারে এ-পাশের ঘরে একটি সুরূপ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!' ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্য। বেতন বাইশ টাকা ছিল—এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় স্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ। মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকায় পড়ে আছ বল দেখি! গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারি চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু! সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তার পর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ ক'রে দেব। তিন বছরে এক-শো টাকা। তা যাত্রার দল ব'লে আর—!

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই। বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ বুঝলে। বউ ক'রে দেবে, একটা ছোঁড়াকে দিয়ে বিক্রী করাব। ভারি লাভ।

গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়ীতে গান করতে হবে বিনো-কাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকিস্বরে বলিল—ধরে নিয়ে যাব হ্যাঁ।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া ধরিয়া একটা বেসুরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ হাসিয়া বলিল—চল্ চল্ যাই। চিরুনীটা কোথায় রাখলেন গুদোমবাবু? আমার আবার ডিউটি আছে—তা চল, দু'খানা গান গেয়েই চলে আসব।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে মা।

কুঠীর মালিকদের কয়েক জন এখানে সপরিবারে বাস করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার ভিতর গান শুনাইতে হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরী হইতে উপন্যাস আনিয়া যোগানোও তাহার একটা কাজ। নিজেই হারমোনিয়ামটা লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদামবাবু বলিলেন—দেখলে হে বাবুর চুল আঁচড়ানো?

বিনুর ঘরের অংশীদার বিনোদের পরিত্যক্ত চিরুনীখানা লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হুঁ।

তার পর আয়না খানায় নানা ভঙ্গিতে মুখ দেখিয়া বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে না-ই বা কেন বল? চেহারা ভাল, গলা ভাল।

স্টোর-বাবু ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই যোগায়—সেটা বল। আর মেয়েনগুলোকে দেখেছ! টাইমবাবু বলতে পাগল।

অতুল ভাবিতেছিল হেন্‌রী ফোর্ড জীবন আরম্ভ করিয়াছিল কাঠের মিস্ত্রী রূপে—এডিসন নামে একটি ছেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে দেড় শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া—পথে—বর্ষার নদী—তখন দু'কূল পাথার, সেই নদী সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পয়সা দিতে গেলে খাবারের পয়সার অভাব পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। আজ সে কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পরে মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে দুইজন বাবু আসিতেছিল। একজন উচ্চকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুঝিল। ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। আজ খাদে বারুদ জলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে উঠছে—এখন ফায়ার না হয়।

অতুল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—গান-পাউডার জলে গেল?

ওভারম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার

স্বভাব। সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের মেন গ্যালারীর পাশে ৫৮ নং সুঁদের মধ্যে—দেওয়ালে—হেই—এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম সর্দ্দার বললে—বাবু ওই কয়লাটা দেগে দি। টোটা তোয়ের ক'রে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি। হঠাৎ গুড়ি হইয়া ওভারম্যান বলিল—ঠাণ্ডা বারুদের—জায়গা নামিয়ে রেখে—।

আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে দেখাইতেছে—বলে বাবু—ঐ চাংটা—আর ইদিকে অমনি ফ্যাঁস ক'রে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় একেবারে দিন দীপ্যমান!

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া ওভারম্যান আবার আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠ্‌তে লেগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠাণ্ডা বেটা কিন্তু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হাঁ করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল। তার পর আপনার বাঁ-হাতখানা খপ্‌ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খপ্‌ ক'রে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় ক'রে আনলাম টেনে।

তার পর সে পাণিপথক্ষেত্রে বিজয়ী আমেদ শা'র মত গম্ভীর ভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি সাদাসিধা মানুষ—বুদ্ধির মত আকারেও স্থূল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও 'পিট'টায় কাজ বন্ধ ক'রে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধর।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার ত হবেই।

মহাচিন্তান্বিত ভাবে ম্যানেজার বলিলেন—তা হ'লে?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি, এখানে যাঁরা মালিক আছেন তাঁদের জানান—আর হেড আপিসেও টেলিগ্রাম ক'রে দিন। তা-হলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই ত' হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চল্‌লাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমার ডিউটি আছে।

প্রকাণ্ড লোহার বিম্—র‍্যাফ্‌টারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেড্‌টা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটকায় সাড়ে তিন-শো ফুট গভীর একটা কূপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন শেড। তাহার পাশেই দুইটা বয়লারের বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটা পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপর একটা হ্যারিকেন চারিপাশের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অসহায় ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিরেই একটা লোহার ঠেঙার উপরেই এক চাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সেই আগুনে সেঁকিয়া একটি কুলির মেয়ে তাহার ভিজা ঝুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ও-পাশের বেঞ্চে বিনোদ—সেই ছেলেটি একখানা খাতায় কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিষ্ট্রার পদবী। বিনুর পাশে বসিয়াছিল শ্যামাপদ—দু-নম্বর ওভারম্যান। সে বলিয়া উঠিল—এই মাগী, ঝুড়িটো কি পোড়ায়ে দিবি না কি ?

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘং-ঘং-ঘং। খাদের তল হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের 'টালোয়ান' ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাঁকিল—হো—ই। এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তারের দড়ায় ঝুলানো একটা লোহার খাঁচা সন্ সন্ শব্দে

অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দড়া বাহিয়া একটা কেজ পিটের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চারজন লোক।

বিনু প্রশ্ন করিল—কারা বটিস রে?

উত্তর হইল—আমরা গো—ভক্তার দল। নারায়ণ ভক্তা।

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত কয়লার কালিতে সর্ব্বাঙ্গঢাকা বীভৎস কালো মূর্ত্তি। জলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নগ্নপ্রায়—পরনে শুধু একটা কৌপীন, কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদের হাতে ঝুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের মধ্যে সাদা দুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিরে গিয়া তাহারা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আগুন—পৃথিবীর বুকের ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—যে আগুন জলে নিভিবে না—সে আগুন নিভাইবার উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করিতে যাইবে! তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘং—ঘং—!

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া আসিয়া পিটের মুখে দাঁড়াইল—ঘটাং! কেজটার মধ্যে কয়লা বোঝাই টব-গাড়ী—লেবার-রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিল, কি বটে কয়লা না স্লাক?

ওভারম্যান একজন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোর? গুরুচরণা—শুন্ শুন্ ইধারে শুন্। হোই—হুঁসিয়ার!

ছোট লাইনের উপর কয়লাভর্ত্তি টবগাড়ীটা ঠেলিয়া দিয়া টালোয়ান হাঁকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়ীটা লাইন বহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি ?

ওভারম্যান বিরক্তিভরে বলিল—না—বলছি গুরুপুত্তুর আমার হেঁথাকে বসেন দয়া ক'রে—আমি পা পূজা করব।

লেবার-রেজিস্ট্রার বিনু খাতা লিখিতে লিখিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিল—'ওহে সুন্দর তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে।'

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি, বাড়ীতে মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখের জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও পোশাক পরিয়া রাণী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ীর ভিতর গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে ও গায় 'সুন্দর তুমি!'···

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মানুষের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাঁকা-হাঁকা-হাঁকা!

পিটের মুখে টালোয়ান দুইজন একটু ঝুঁকিয়া সাড়া দিল—ও—ই!

অতুল একটু অন্যমনস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারের দিকে চাহিল। চারিদিকের কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকারে রাত্রির অঙ্গে দূষিত ক্ষতের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েকজন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী। মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা রূপদস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, কব্জীতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার খানিকটা বিরাম। ইঞ্জিন স্তব্ধ, 'কেজ'টা নিথরভাবে ঝুলিতেছে।

শুধু বয়লারটা স্টীমের শক্তিতে কাঁপে—সে কম্পনের আঘাত বায়ুস্তর বহিয়া শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপ্রাগুলা কাঁপে—ছোট একটা জানালা—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান, 'টালোয়ান' কড়ি গুণিয়া 'রেজিং'-এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার ঠেঙোটায় কয়লার চাপ জ্বলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারা এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিবের আলোতে একটা তরুণী বিড়ি ধরাইয়া দপ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল। সে বলিল—দে, নামাই দে বাবু। ক-ত ব'সে রইব?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেশা না, ক্ষুধার প্রেরণা?

বিনু বলিল—এখন খাদে গিয়ে ত ঘুমুবি। তার পর সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই ত পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—তু নাচবি বল!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মারবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তার পর অকস্মাৎ এক বুড়ীকে ধরিয়া বলে—এই দেখ্ ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশপাশের তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লার ধারে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জ্বলন্ত চুল্লীটায় ঢেলা মারিতেছিল। দূরে এই কুঠিরই সাইডিং লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া উঠে। অতুল পিছন ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংসনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির খদ্যোতের মত জ্বলিতেছে। এ-পাশে বয়লারের চোঙ হইতে উর্দ্ধমুখী আগুনের শিখা সাপের জিভের মত লক্-

লক্ করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাজারে হাজারে আগুনের ফুল্‌কি ফুলঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, বুদ্বুদের মত নিভিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্যদিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দ্দান্তপনায় বোবা রাত্রি অস্থির হইয়া ওঠে।

বিনোদ চমকিয়া উঠিল—কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুড়িয়া মারিয়াছে। লোহার 'কেজ'টা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল্ খিল্ হাসি অতি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ—ইঞ্জিন স্তব্ধ—শুধু বয়লারের স্টীমের শব্দ ফ্যাস—ফ্যা—স। কেজ্‌ম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছিল। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন।

অতুলের মাথাও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। হেন্‌রী ফোর্ড কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ীর কথা—মা'কে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়, ছুটি লইয়া একবার বাড়ী যাইতে হইবে। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। ধোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয় ত স্বপ্নের ঘোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয় ত আগুনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয় ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খরচের বিলি ব্যবস্থা করিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকীদার এক চোখ কাণা সেম্‌রা হাঁক দিয়া চলিয়াছে—হো—হো—ও—হো।

টালোয়ান বা কেজ্‌ম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে হাঁকিল। ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানেরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে তন্দ্রারক্ত চোখে বলিল—চাকরে আর কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে?

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে, নয়?

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্ক বাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খারাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ।

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব?

—খাদে মালকাটারা টিকতে পারছে না।

অতুল নির্ব্বিকারভাবে বলিল—ম্যানেজার বাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকে ক'টা সুঁদে ত ধোঁয়ায় ভর্ত্তি—আর উত্তাপ কি! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হ'ল।

অতুল বলিল—সেগুলো বাদ দিতে বলেছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে! একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এ সব ত আমার ডিউটি নয়!

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যান বাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আসুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস বাতিটা জ্বালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতল গহ্বরের মধ্যে কেজ্‌টা সন্‌ সন্‌ শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি রন্‌ রন্‌ করিয়া উঠিল। প্রথমদিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ অনুভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন্‌ সাঁওতালের মেয়ে ওই কেজে ই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বহিয়া জল ঝরিতেছে। নীচের জল-ঝরার শব্দ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া আসিল।

কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

উপরে পিটের মুখে ও-কেজ্‌টাও সঙ্গে থামিল। বিনোদ স্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিল—সে বলিল—উঠে এলি যে তুই ?

কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে ধুঁয়ো আর গরম খাদে—পালায়ে এলম। তারপর ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুর গান শুন্‌তে এলম।

বিনোদ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—ভাগ্‌ এখান থেকে। শেডের কয়লার ধূলার উপরেই আঁচল বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি গুমোর হইছে, লয় গো বাবু!

বিনোদ কোন উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেয়ে আমি ভাল গান জানি। শুন্‌বি। সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হুই যি তারাটি দিপ্‌ দিপ্‌ করছে—ওইটি ভুল্কো তারা লয় গো বাবু ?

বিনোদ তবুও কোন উত্তর দিল না। চুড়কী এবার উঠিয়া আসিয়া তাহার

কাছে বসিল, বলিল—একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে—তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলবি।

বিনোদের ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার নবজাগ্রত যৌবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—গান ত আমি তোকে শোনাব—তুই কি দিবি আমাকে?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর বলিল—একটি ক'রে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল,—ধেৎ জবাফুল নিয়ে কি করব আমি?

—কেনে কানে পরবি—লয়ত চুলে গুঁজবি। তু আমাকে রোজ গান বলবি, হোক্।

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল। দু'পাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসের আলোকের প্রতিচ্ছটায় কয়লার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোণগুলি ছুরির মত চক্‌চক করিয়া উঠিতেছে। হাতের আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিশ্বাসের ফুৎকারে আলোকটা নিভিয়া গেল। অন্ধকার! কোথাও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্ভুত—বিচিত্র! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। টানেলটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকটা ফিরিয়া দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—কে আবার বাঁশীও বাজাইতেছে। টানেলের পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। দু'টি ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। কতকগুলি মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে মোড় ফিরিল। এইদিকেই আগুন। উত্তাপ—

ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার জীবনের অনেক দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা সব পিটের মুখের কাছে গিয়ে ব'স, ম্যানেজার এলে কাজে লাগবি।

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন যত খরচ হয়, কোন ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিষ্কারভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে আমার জীবনবিপন্ন ক'রে আপনার উপকার করব? আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর পূর্ব্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা। সেদিন তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—এ-কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি অতুলবাবু।

অতুল হাসিয়া বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এতদিন আপনার এখানে রয়েছি, বিনা পরিশ্রমে কোন দিন ত আপনার কাছে বেতন আমি নিই নি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্য্যন্ত আমি আমার কর্ত্তব্যে এক বিন্দু অবহেলা করি নি।

মালিক বলিলেন—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—একজন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যা নিত তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কন্ট্রাক্ট ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজেকলমে একখানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিকস্ আর ফায়ার-ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ ক'রে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিভবে, স্যর। নইলে জলে খাদ ভর্ত্তি ক'রেও নিববে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন সেইদিনই আবার গ্যাস হতে শুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু স্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিংএর শব্দ উঠিতেছিল অলসভাবে।

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিসপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গোল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিক্রুটার কুলিদের বড় প্রিয়। সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে বিনা দম লিয়ে আমরা মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কতকগুলো কুলি কাল রাত্রে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—দু-টাকা ক'রে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে বলুন।

রিক্রুটার চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিক্স্ বোঝাই একটা টবগাড়ী পিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার? টাকায় দুনিয়া কেনা যায়—মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সঙ্কেত করিয়া হাঁকিল—হো—ই! ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

মেসের ঘরে ঘরে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়িবে কে জানে। কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে! সার্ভেয়ার বাবু প্ল্যান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিনুর হারমোনিয়ামটা বন্ধ। কেরাণী সীতাপতির ছবির খাতা বাক্সে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটিগুলা শুকাইয়া গেছে। স্টোরবাবু জিনিস জমা করিয়া আয় খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোশাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানালা হইতে কে বলিল—একটি গান কর্ কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয় আরও দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুশ্রী কালো বর্ব্বর মেয়েগুলার অত্যাচারে তাহার গ্লানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও ঘৃণা বোধ হয়। সে কহিল—যা যা বিরক্ত করিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ কর্ছিস্ কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে আমরা চলে যাই।

একজন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনেছে। দে গে—চুড়কী বাবুকে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুড়িয়া বিনোদের বিছানায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু কানে উটি পর। বড়া ভাল লাগবে তুকে।

বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহার একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রূঢ়ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না! বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাবু তোরা এখন। জ্বালাস নে আমায়, খাদে যাব দেখছিস্ না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ ত পুড়ে গেইছে তুদের।

—তোদের মাথা হয়েছে। তোরা কাজ করবি না—আর তোদের কাজ আমাদিগে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস্ তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোকা জাত বটে বাবু।—মরে কেন যাবি? এই ত আমি চল্‌লাম। তোদিকে দু-টাকা তিন টাকা ক'রে হাজরী দেবে। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হাঁ—বাবু সত্যি—তিন টাকা ক'রে দিবি তুরা? আর মরে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি ত বাবু খাদে? না—আমাদিগে ফেলে দিয়ে পালায়ে আসবি?

—ভ্যালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবার যো কি? চাকরি যাবে যে।

নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটাদিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তুক গান শুনাতে হবেক্।

তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল চল।

বর্ব্বর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয়জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তুরা তিন্ টাকা ক'রে দিবি!

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হা বাবু—তুরা আমাদের সাথে রইবি ত?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তা-ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্য বাবুরা থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

—বেশ, বাবু তবে আমরা নামব। মাঝিন্‌দের নামতে দিবি ত?

অতুল জানিত এই মাঝিন্‌দের ফেলিয়া ইহারা কোথাও যায় না। রাজসিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল—বেশ তারাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ করিলেন—সে যে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজ ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল—নেসেসিটি হ্যাজ নো ল'। আইন মানতে গেলে খাদ পুড়তে দিতে হবে।

তারপর হাঁকিল—হো—ই—ইঁটার গাড়ী লাও।

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্ম্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের বেতন মিটিয়া যাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার। গীয়ারহেডের চাকা দুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে। ঘং—ঘং—ঘং।

নীচে হইতে সঙ্কেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সঙ্কেত করিল, হো—ই। মিনিট দুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপরে আসিয়া লাগিল। একজন বাবু একটি কুলি ও একজন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটির বুকে ব্যথা ধরিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আল্‌গা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটির নাকের কাছে ডাক্তার ধরিয়া বলিল—ভয় নাই।

নীচে হইতে আবার সঙ্কেত আসিল—ঘং—ঘং—ঘং।

আবার লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল, মাটি—মাটির গাড়ী জল্‌দি চালাও।

মাটির গাড়ী লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন দু-গুণে ছয়—এই লে মাঝি, ছ-টাকা হাজরী তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোঝাই টব গাড়ীটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; একজন আসিয়া ঠেলিয়া সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আরও ভিতরে, যেখানটায় আগুন লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথনি উঠিতেছিল।

বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের ফনেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার দুইটা নল নাকের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারীর মুখে মুখে ফিরিতেছিল।

সে বলিল—জল্‌দি—জল্‌দি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই, চালাও। দেরি হ'লে সব নষ্ট হবে। গ্যাস-সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়াছিল। চুড়কী বহিতেছিল কাদা, তাহার মাঝি ইঁট যোগান দিতেছিল। কাদার পাত্রটা ফেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল —লারব আর আমি। সে হাঁপাইতেছিল। বিনোদ বলিল—যা-যা ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আয়।

—হঠ্ যাও—হঠ্ যাও। ইঁটাকে গাড়ী যাতা হ্যায়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—ফায়ার-ক্লে। অতুল হাঁকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে হাঁকিল, আদ্‌মী গির গিয়া হিঁয়া। জল্‌দি লে যাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল—আর দুটো —আর দুটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের কষ্ট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয়। ধরণীগর্ভে আগুন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝটকায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী পড়িয়া গিয়াও খিল্ খিল্ করিয়া

হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা ঠোকর মারিয়া বিনোদ বলিল —লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব আমি।

চুড়কী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ায় বাষ্পে ভাল করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অস্ফূট কান্নার শব্দ সে যেন তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিরিল। ডাকিল—চুড়কী—এই চুড়কী কাজে যা—উঠে যা।

—না—আমি যা-ব না। তু কেনে আমাকে ল'াথায় মেলি?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ী আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল —সে হাঁকিল—হো—হো,—ই—হঠ্ যাও।

বিনোদের আর সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হুড় হুড় শব্দে টব-গাড়ীতে যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়জনে কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—ঘণ্টি মারো টালোয়ান, ঘণ্টি মারো জল্‌দি। পাঁচ আদ্‌মি গির্ গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার একজন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি? গ্যাস একদিক দিয়ে জোর ধরেছে। পিছিয়ে আসতে হ'ল?

—ক' নম্বর পর্য্যন্ত পেছুতে হ'ল?

সন্ সন্ শব্দে কেজ্‌টা উঠিয়া গেল, উত্তর আর শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল পনেরো নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বারোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হ'ল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল,—গাঁথনি ভাঙো। ভেতরে লোক।

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট্ আউট।

বিনোদ সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি। তারপর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

ক্যাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটি টাকা বিনোদের হাতে দিয়া বলিল,—তোমার মাইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে কলিয়ারী ছেড়ে যাও। ছটু সিং!

—হুজুর! ছট্টু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠীর সীমানা থেকে বের ক'রে দেবে।

নীচে তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল রুমালে কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি লাভ্স হার।—প্রকাশ ক'রে ফেলবে। ফুল্! জানে না যে-সম্পদ বাঁচল তাতে ওই মেয়েটির কত হাজার স্ত্রী-পুরুষের জীবিকার সংস্থান হ'ল। প্যাকিং দাও—ফায়ারক্লের প্যাকিং দিয়ে দাও—যেন এক বিন্দু গ্যাস না আসে।

আগুন থামিয়া গেছে। আবার কলিয়ারী তেমনি চলে। কেজ ওঠে-নামে। রাত্রিতে কুলি-কামিন ভিড় করিয়া আসে, বাবুরা নাম লেখে।

টালোয়ান হাঁকে—হো—ই।

ইঞ্জিন চলে—কেজটা নামিতে থাকে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পাখীর প্রভাতী কলরবের সঙ্গে সঙ্গেই সেতারপর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন তানপুরায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ আচার্য্য সাধিতেছিল একখানি ভৈরবী। আবেশে তাহার চোখ দুটি মুদিত হইয়া আসিয়াছে। তানপুরার উপর গাল রাখিয়া সে গাহিতেছিল—'চরণে চন্দন রাঙা জবা দিলে কে-রে!'

রুদ্রমূর্ত্তিতে একগাছা লাঠি হাতে ও-পাড়ার শ্যাম ঘোষাল আসিয়া বিনা ভূমিকায় হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিল—হারাণে—শালা—!

তানপুরাটার স্ফীত উদরের উপর বাঁ হাতে তালি মারিয়া হারাণ তাল দিতেছিল। ফাঁকের ঘরে বাঁ হাত তুলিয়া হারাণ ইসারা করিল—সবুর। গানটা উপভোগ্য রূপে জমিয়া উঠিয়াছিল। ঘোষাল বসিল। যথাসময়ে গান শেষ করিয়া হারাণ তানপুরাখানি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিতে দিতে কহিল—কি?

ঘোষালের রাগের সময় বোধ করি পার হইয়া গিয়াছিল। সে কাকুতি করিয়া বলিল—হারাণ, আমার ঠাকুর?

হাতের মেজরাপটা খুলিয়া হারাণ কহিল—জানি না ত।

ঘোষাল জোড়হাত করিয়া বলিল—দে ভাই,—কোথা রেখেছিস—কি, ফেলে দিয়েছিস বল!

হারাণ বলিল—তোমার ঠাকুর ত আমি দেখেছি বাপু; আনাটেক সোনার একটা পুট-পুটে পৈতে ছিল। সে আমি হাত দিই নাই। ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ আমি করি না।

ঘোষাল আরও মিনতি করিয়া বলিল—তোর পায়ে ধরি ভাই, আমার তিন-পুরুষের শালগ্রাম শিলা, দে ভাই। বল্ কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

হারাণ কহিল—বিশ্বাস না কর ত কি বলি বল। সত্যিই আমি জানি না।

ঘোষাল আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কুষ্ঠব্যাধি হবে, মুখ দিয়ে পোকা পড়বে। চণ্ডাল—চোর—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—।

হারাণ কোন উত্তর দিল না। সে তানপুরাটা আবার কোলের উপর উঠাইল।

ঘোষাল সরোষে কহিল—দিবি না তুই? আমি পুলিসে খবর দেব—

হারাণ অবিচলিতভাবে তানপুরার তারের উপর আঙ্গুল চালাইয়া দিল। স্বর-ঝঙ্কারে যন্ত্রটা সাড়া দিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঘোষাল তাহার পায়ের গোড়ায় ক্ষিপ্তের মত মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল—মরব, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

তাহার স্বর অবরুদ্ধ, চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

হারাণ বলিল—কেন মিছে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ছ ঘোষাল? যাও না, ভাল ক'রে সব খুঁজে পেতে দেখ না গিয়ে। গোল পাথর ত, গড়ে' টড়ে' প'ড়ে গিয়ে থাকবে। পুষ্পকুণ্ড-টুণ্ডগুলো দেখগে যাও।

ঘোষাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—পাব—পাব—, পুষ্পকুণ্ডের মধ্যেই পাব হারাণ?

—দেখই না গিয়ে।

ঘোষাল দ্রুতপদে চলিয়া গেল, হাতের লাঠিগাছটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। যন্ত্রটায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ এবার ধরিল একখানি বাগে-শ্রী। গান চলিতেছিল, নিশি স্বর্ণকার আসিয়া দাওয়ার উপর নীরবে বসিল। গান শেষ করিয়া হারাণ বলিল—একবার তামাক সাজ দেখি নিশি।

হারাণের ঘরদুয়ার নিশির পরিচিত, সে তামাক টিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। যন্ত্রের তারগুলি শিথিল করিয়া দিয়া কাপড়ের খোলের মধ্যে সযত্নে যন্ত্রটিকে পুরিয়া দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল।

নিশি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে কহিল—একজন খরিদ্দার এসেছে দাদা-

ঠাকুর। কিছু সোনা বেচবে? দরও এখন উঠেছে—চব্বিশ দশ আনা পাকা বিকুচ্ছে।

হারাণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

নিশি ডাকিল—দাদাঠাকুর!

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—না।

নিশি মৃদুস্বরে বলিল—কি করবে এত সোনা নিয়ে? আমিই ত গলিয়ে বাট তৈরী ক'রে দিয়েছি—দেড় সের সাত পো' ত হবেই। কিছু ছেড়ে দাও এই সময় বুঝলে?

—টাকা নিয়েই বা কি হবে আমার?

—জমি-টমি কেন। কিম্বা দাদন-পত্র কর। এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর বুঝলে। আজন্মই কি এমনি ক'রে কাটিয়ে দেবে না কি?

হারাণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। নিশি কলিকাটা কোলের কাছে নামাইয়া দিল, বলিল—খাও।···আরও একটা কথা দাদাঠাকুর,—ওসব কাজ এইবার ছাড়। আর কেন? ঠাকুর-দেবতার অলঙ্কার—ও আর ছুঁয়ো না। ও হচ্ছে কাঁচা পারা—হজম কারও হয় না।

এতক্ষণে হারাণ কথা কহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মৃদুস্বরেই বলিল—এই দেখ বাবা—হাত দেখ—পা দেখ, শরীর দেখ, খসেও যায়নি, রোগও হয় নি। আর নিতেই যদি হয় তবে দয়াল দেবতার নেওয়াই ভাল। ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে দেখে, ধরে না—কাউকে বলে দেয় না, চ্যাঁচায় না, দুঃখ করে না।···কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনাদানা—রামচন্দর!···কাল রাত্রে, বুঝলি, ওই ঘোষালদের ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছিলাম। গোল একটা নুড়ি, তাকে বেড় দিয়ে একটা সোনার পৈতে! নিলাম টেনে ছাড়িয়ে, তারপর ভাবলাম, দিই ছুঁড়ে ফেলে। আবার ভাবলাম, থাক, এই পুষ্প-কুণ্ডের মধ্যেই থাক। আবারও ত পৈতে গড়িয়ে দেবে—সেইটাই হবে হাতের পাঁচ।···নে, কল্কে নে।

নিশি কহিল—আচ্ছা, এসব যে তুমি করছ—কি জন্যে করছ বল ত ? না করলে সংসার, না কিনবে সম্পত্তি,—কি হবে এতে তোমার ?

হারাণ বলিল—কল্কেটা পাণ্টে সাজ,—ওটাতে আর কিছু নাই। তারপর গুন্ গুন্ করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি আবার তামাক সাজিতে বসিল। টিকেতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল—জিনিসগুলো যত্ন ক'রে রেখেছ ত দাদাঠাকুর ? দেখো, চোরের ধন বাটপাড়ে না নেয় !

মৃদু হাসিতে হাসিতে হারাণ বলিল—সে এক ভীষণ কেলে সাপ—ইয়া তার ফণা—আমি যে ওস্তাদ, আমাকেই বলে,—দুইটি হাতের তালু পাশাপাশি যোগ করিয়া ফণার পরিধি বর্ণনা করিতে করিতে হারাণ সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

দিন দশেক পর।

সেদিনও নিশি বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। হারাণ কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠি লইয়া ছোট ছোট আঁটী বাঁধিতেছিল। নিশি কহিল,—এর মধ্যে নবগ্রহের ন'রকম শুক্‌নো কাঠ কোথা থেকে যোগাড় করলে দাদাঠাকুর ? তোমাদের দৈবজ্ঞিদের সন্ধান বটে বাপু !

হারাণ বলিল—তুইও যেমন, দেবে ত চার আনা পয়সা, তার জন্যে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় আনন্দ-কাঠি, কোথায় এ—কোথায় তা, যোগাড় ক'রে বেড়াই আমি। নিয়ে এলাম শুকনো ডাল একটা—তাই বেঁধে আঁটী ক'রে দিচ্ছি। এই কি দিতাম ? বছরে বছরে রায়পুরের বাবুদের বাড়ী একটা ক'রে পার্ব্বণী দেয়, তাই, নইলে—হ্যাঃ।

—কিন্তু দেবকার্য্যের জিনিস, শান্তি-স্বস্ত্যেন করবে তারা।

মৃদু হাসিয়া হারাণ বলিল—আমাকে ত সবাই জানে বাবা, জেনেশুনে সব

আমার কাছেই বা আসে কেন? গ্রহের ফেরে যজ্ঞ তাদের পূর্ণ হবে না, তার আর আমি কি করব?

একটি লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে 'নব-গেরোণে'র কাঠ নিতে এসেছি।

হারাণ বলিল—এই যে বাবা বেঁধে বসে আছি আমি। তোমার বাড় রায়পুর ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পয়সা এনেছ—চার আনা পয়সা?

লোকটি একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

হুঁকা কলিকা হারাণের হাতে দিয়া নিশি বলিল—এ কিন্তু তোমার ভাল নয় দাদাঠাকুর, যাই বল তুমি। এতদিন বিদেশে-বিভূঁয়ে যা করেছ ধরতে পারে নাই কেউ, এবার তুমি গাঁয়েও আরম্ভ করলে? আবার এই লোক ঠকানো—

হারাণ হুঁকায় টান দিয়া বলিল—আর বুঝি জল হয় না,—মেঘ ধ'রে গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশি বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল—ঘোষাল পুলিশে ডায়রী করেছে শুনেছ?

হারাণ বলিল—মিছে কথা। হ'লে এতদিন খানাতল্লাস হয়ে যেত। আর করলে ত করলে, সাক্ষী প্রমাণ ত চাই।

একখানা ছইওয়ালা গোরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। ও প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া হারাণ প্রশ্ন করিল—কোথাকার গাড়ী হে?

গাড়োয়ান গাড়ী নামাইতেছিল। ছইয়ের মধ্য হইতে একটি বিধবা মুখ বাড়াইয়া কহিল—ভালো আছ দাদা?

হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণ সবিস্ময়ে কহিল—কে রে,—হৈম? তুই হঠাৎ যে?

গাড়ী হইতে হৈম নামিয়াছিল, পিছনে তাহার বালক-পুত্র তমোরীশ। দাদার

পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৈম বলিল—বন্যেতে বাড়ী ঘর সব পড়ে গিয়েছে দাদা। এমন আচ্ছাদন নাই যে মাথা গুঁজে দাঁড়াই। কোথা, কার কাছে দাঁড়াব বল? অবস্থা ত জান—ঘর যে আবার ক'রে নিতে পারব—সে সম্বলই বা কোথা? ভগবান শেষকালে তোমারই কাছে দাঁড় করালেন আমাকে।

হারাণ কহিল—তা বেশ বেশ। তোরও ত বাপের ঘর। আয় ভাই আয়। বেশ করেছিস। তমোরীশেরই ত সব—হু'দিন আগে আর পরে।

নিশি কহিল—তা' বৈকি, এ গুষ্ঠীর অধিকারীই ত উনি।

হৈম আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ছেলেকে ভৎ র্সনার স্বরে বলিল,—মামাকে প্রণাম কর তমোরীশ! ছিঃ, এত বড় ছেলে, এও বলে দিতে হবে?

কোলের কাছে ফুট্‌ফুটে ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া হারাণ বলিল—বকিস নে হৈম, অচেনা জায়গা—আমিও অচেনা—

মৃদু অনুযোগ করিয়া হৈম বলিল—চেনা না দিলে চিনবে কি ক'রে বল? এই ত দশ কোশের মাথায় থাকি। মলাম কি থাকলাম বোনের খোঁজও ত নিতে হয়। শেষ গিয়েছ তুমি, আমি বিধবা হ'লে—সে আট বছর হ'ল। তমোরীশ তখন তু-বছরের ছেলে, কেমন ক'রে চিনবে বল?

লজ্জিত হইয়া আচার্য্য কহিল, আয়, আয় ভাই, বাড়ীর ভেতরে আয়।

তমোরীশকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

গৃহিণীহীন গৃহখানিতে আবর্জ্জনা না থাকিলেও মার্জ্জনার পারিপাট্য নাই, অভগ্ন অবয়ব হইলেও সম্পূর্ণ নয়, গৃহের মধ্যে যে একটি শ্রীময়ী মমতা থাকে—তাহা নাই।

হৈম বলিল—মায়ের আমলে কি রূপই ছিল এই ঘরের। সেই ঘর!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারাণ নিশিকে ডাকিয়া কহিল—চার পয়সার ভাল মিষ্টি এনে দে দেখি নিশি। ছেলেটা প্রথম এল—

সিকিটা হাতে লইয়া নিশি বলিল—ডাল নুন তেল কি আর কিছু যদি আনতে হয়, একেবারে আনতে দাও না।

—দৈবজ্ঞের বাড়ী রে এটা, ভুজ্যির ডাল নুন আছে। দু-পয়সার তেল আনিস বরং। আর ভাবছি—মশারি একটা চাই আবার, যে মশা এখানে। বারো আনার কমে হবে না, কি বলিস? তোর ঘরে বাড়তি নেই রে?

খিড়কী হইতে ফিরিয়া হৈম কহিল—ছি ছি দাদা, ঘাট-পাঁদাড়গুলো ক'রে রেখেছ কি? জঙ্গলে যে মানুষ ডুবে যায়। বিয়েও করলে না—না দাদা, এবার তোমার বিয়ে দোব আমি।

আচার্য্য নিশিকেই বলিল—না থাকলে কি আর হবে। তা হ'লে রামা তাঁতীকে বলবি একটা মশারির জন্যে। নিয়েই বরং আসবি। ওর ছেলের রাশি-চক্রটা দিয়ে যেতে বলবি, কুষ্টী ক'রে দেব।

নিশি বলিল—সে আমি পারব না বাবু। তুমি একটা মিথ্যে যা-তা কুষ্টী ক'রে দেবে, সে পাপের ভাগী আমি হই কেন। তার চেয়ে আমি নিজে দায়ী হয়ে নিয়ে আসব। তুমি পয়সা পরে দিয়ো আমাকে।

সে চলিয়া গেল।

নিশি চলিয়া যাইতেই হৈম বলিল, একটি কাজ তুমি করতে পাবে না দাদা। তোমার পায়ে আমি হত্যে দেব। ঠাকুর-দেবতার জিনিস।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আচার্য্য কহিল—না, সে ত আর করি না।

নিশীথ-রাত্রে হ্যারিকেনটি অনুজ্জ্বল করিয়া দিয়া হারাণ খিড়কীর ঘাটে গিয়া নামিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আলোটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর ঘাটের বাঁ পাশে ভাঙ্গিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি আকন্দ গাছের তলা খুঁজিয়া বাহির করিল একটি ঘটী। সেটাকে লইয়া সে নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

থানা পুলিশের সংবাদটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। দফাদারটা দিন তুই হইল গান শুনিবার ছলে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া গেল।

গতরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে গিয়া হারাণের নজরে পড়িল দু'টি মানুষ।

সে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

উত্তর হইল—আমরাই গো।

আচার্য্য আবার প্রশ্ন করিল—আমরাই কে হে বাপু ?

—আমি রামহরি দফাদার আর সঙ্গে থানার মুহুরীবাবু! রোঁদে বেরিয়েছি।

সকালে উঠিয়া রাগিণী আলাপ তেমন জমিল না। তমোরীশ বসিয়া আছে; প্রথম দিন হইতেই যন্ত্র-ঝঙ্কার উঠিলেই সে আসিয়া বসে। নিশিও নিয়মিত আসিয়াছিল। গান শেষ করিয়া আচার্য্য নীরবে তামাক টানিতেছিল।

হৈম আসিয়া দাঁড়াইল। সে বোধহয় দাদার নিকট হইতে প্রথম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সেই প্রথমে ডাকিল—দাদা!

আচার্য্য মুখ তুলিয়া চাহিল।

—আজ তমোরীশকে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবে দাদা ?

হারাণ বলিল—উঁহু—আজ দিন ভাল নয়।

হৈম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—কাকে কি বলছ ? আমিও যে দৈবজ্ঞের ঘরের মেয়ে দাদা। দিন ভাল মন্দ—

সপ্রতিভ ভাবে হারাণ বাধা দিয়া বলিল—না,—মানে—পয়সা নেই হাতে আজ। আর ভাল দিন ত আরও আছে।

ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৈম বলিল—তাই হবে। কিন্তু বই ক'খানা কিনে দাও।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল—দেব।

হৈম চলিয়া গেল।

যন্ত্রগুলায় আবরণ পড়াইতে পড়াইতে আচার্য্য কহিল—তমোরীশ, ভেতরে যাও ত বাবা!

বালকের বিলীয়মান পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিয়া হারাণ মৃদুস্বরে নিশিকে কহিল—আমার বাড়ীটা কিনবি নিশি? যা হয় দাম দিস তুই। পুলিশ বড্ড আমার পিছনে লেগেছে।

নিশি চমকিয়া উঠিল। আচার্য্য বলিল—ভবী মিশ্রীকে দিলে দু'শো টাকায় সে এখুনি নেয়। কিন্তু শালা পুলিশের গুপ্তচর—ঠিক বলে দেবে। তুই নে,··· এক-শো টাকা তুই আমাকে দিস—না—একশো পাঁচ।

নিশি কহিল—দিদিঠাকরুণ, তমোরীশ, এরা কোথা যাবে?

হারাণ আর কথা কহিল না।

পরদিন সকালবেলা আর হারাণের সেতার বাজিল না। নিশি আসিয়া ফিরিয়া গেল। তমোরীশ আবিষ্কার করিল মামার যন্ত্রগুলির মধ্যে তানপুরাটা নাই।

সন্ধ্যায় নিশি আসিয়া দেখিল—হৈম বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পাশেই ম্লানমুখে কয়খানি নূতন বই হাতে তমোরীশ বসিয়া ছিল।

নিশি শুনিল হারাণ ভবী মিশ্রকে পঁচানব্বই টাকায় বাড়ী বেচিয়া কাশী চলিয়া গেছে। যাইবার সময় কয়খানি বই তমোরীশকে দিবার জন্য দিয়া গেছে।

আচার্য্য কিন্তু কাশী যায় নাই। সে বর্দ্ধমান জেলা পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পড়িল। নিতান্ত পথে পথে যাত্রা। কাঁধে এক কম্বল, একটি পুঁটলী, হাতে তানপুরা।

একখানা গ্রামে প্রকাণ্ড দালান ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

মুর্শিদাবাদ আমিরী চালের জন্মভূমি; বনিয়াদি চাল—পুরানো বন্দোবস্ত আজও এখানে নিঃশেষ হয় নাই। এ বাড়ীর বন্দোবস্তও পুরানো। অতিথিকে এখানে

মানুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় না, দেবতার প্রসাদ কামনা করিয়া দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়।

অপরাহ্নবেলায় নজরে পড়িল বনিয়াদি চালের অভাব এখনও সেখানে নাই।

ঠাকুরবাড়ীর পাশেই বাবুদের বৈঠকখানায় বড় হলে আসর পড়িতেছে, ঝাড়ে দেওয়ালগিরিতে বাতি বসানো হইতেছে।

হারাণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ছিলম্‌চী খানসামার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকাণ্ড বড় ছিলম্‌দানীটা কলিকায় কলিকায় ভরিয়া গেছে।

খানসামা বলিল—বড় সেতারী এসেছেন,—মজলিস বসবে আজ।

হারাণ কহিল—আমাকে শুনবার একটু সুবিধে ক'রে দিতে হবে ভাই। তানপুরাটা সে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিল। সেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া খানসামা কহিল—আপনিও কি ওস্তাদ নাকি?

আচার্য্য বলিল—গান-পাগলা মানুষ দাদা। ওস্তাদ-টোস্তাদ কিছু নই।

মজলিসে স্থান সে পাইল।

দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া পড়িয়াছিল। সোনা-রুপার সাত আটটা গড়গড়া পড়িয়া আছে। রুপার পরাতে প্রচুর পানের খিলি, আতর-দানে আতর ও তুলা শোভা পাইতেছিল। দুই-তিনটা গোলাপপাশ হইতে গোলাপজল ছিটানো হইতেছিল। প্রকাণ্ড চারিটা হাতপাখা লইয়া চারিজন খানসামা চারি কোণে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল। সুগন্ধি ধূপ ঘরের চারিদিকে জ্বলিতেছে। ফরাসের এক কোণে সে বসিল। প্রথমেই বিতরণ করা হইল পান ও আতর। সম্মানী-সম্ভ্রমী ব্যক্তিদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইল।

তারপর আরম্ভ হইল সঙ্গীত। ওস্তাদের সুনিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সেতার সত্য সত্যই গান গাহিয়া উঠিল। জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারে মানুষ, আলো, এমন

কি ঘরখানার সব উপাদান পর্য্যন্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেল। ঘরের জানালার গরাদেতে হারাণ হাত দিয়াছিল, সে অনুভব করিল লোহার গরাদের মধ্যেও সে-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের গতি দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, দুনে বাজনা চলিল। আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তারের মধ্য হইতে সুরের ফুলঝুরি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মধ্য পথেই কিন্তু সঙ্গীত শেষ করিতে হইল। যন্ত্রী তবলচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপ্‌কো হাঁত আর নেহি চলেগা।

বাদক লজ্জিত হইয়া বলিল—আমার শিক্ষা সামান্যই।

অবসর পাইয়া খানসামা সরবৎ ধরিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। ফুরসী গড়গড়ার ডাকে মজলিসটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধুতুরা ফুলের মত লম্বা একটি রূপার কলিকা আসিল ওস্তাদের জন্য। ওস্তাদের হাত হইতে কলিকাটা ঘুরিয়া বেড়াইল।

ওস্তাদজী আবার সেতার তুলিয়া কহিলেন—আওর কোই হ্যায় সঙ্গত করনেকো লিয়ে।

মালিক মনোহর সিংহ চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে লজ্জিতভাবেই বলিলেন—দুস্‌রা আদমী ত কোই নেহি হ্যায়!

হারাণ উঠিয়া পড়িল। আভূমিনত এক নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিল, হুজুর—হুকুম হয় যদি, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

গৃহস্বামী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পারবে তুমি?

ওস্তাদ কহিলেন—আইয়ে—বয়ঠিয়ে!

একজন বলিয়া উঠিল—পাগল নয় ত?

ওস্তাদ কহিলেন—কোকিল বনমে রহে বাবুজী—রং ভি কালা উস্কা। লেকেন গানেওলাকে বাদশা ওহি।

গৃহস্বামী আতর-পানে মান্য করিয়া হারাণকে সঙ্গত করিতে অনুমতি দিলেন। সঙ্গত আরম্ভ হইল।

আচার্য্যের হাতে চর্ম্মবাদ্য সেতারের সুরে সুর মিশাইল। অপূর্ব্ব সমন্বয় সুসঙ্গত রূপে সঙ্গত শেষ হইল। ওস্তাদ যন্ত্রখানি পাশে রাখিয়া তারিফ করিয়া উঠিলেন—বহুৎ আচ্ছা। বহুত মিঠা হাত আপ্‌কা।

মালিক একগাছি মালা আচার্য্যের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন—ওস্তাদজীর কোথায় বাড়ী? কি নাম আপনার?

জোড়হাত করিয়া হারাণ কহিল—হুজুর আমি ভবঘুরে। গানবাজনা ক'রেই বেড়াই। নাম আমার নারায়ণচন্দ্র রায়।

এ নামটা পথে পা দিবার সময়ই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

সেতার সঙ্গতের শেষে ওস্তাদের অনুরোধে হারাণ গানও গাহিল। খুশী হইয়া মনোহরবাবু হারাণকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিলেন।

পাত্রটি কপালে ঠেকাইয়া হারাণ সসঙ্কোচে নামাইয়া রাখিল, করজোড়ে কহিল—হুজুর, সুরের কারবারী আমি, সুরা আমার গুরুর নিষেধ।

ওস্তাদজী কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা। সাচ্চা আদমী আপ্।

মনোহরবাবু জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—মদ না খাও, মাতলামী কিন্তু করতে হবে।

হারাণ কহিল—নাচব হুজুর? বাইজী নাচ?

চারিদিক হইতে রব উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুত আচ্ছা।

মনোহরবাবুর আশ্রয়েই হারাণ আচার্য্য থাকিয়া গেল। এমনি একটি আশ্রয়ই যেন সে খুঁজিতেছিল। জীবনের চারিদিকে বিলাসের আরামে তাহার যেন ঘুম আসিল। কর্ম্মের দায়িত্ব নাই, শুধু বাবুর মনস্তুষ্টি করিলেই হইল। বাবু ঘামিলে সে বাতাস করে, অকারণে ছিলমচী খানসামাকে ধমক দিয়া নূতন কলিকা দিতে আদেশ দেয়। মনোহরবাবু শিকারে যান, সঙ্গে হারাণ থাকে। সে অবিকল

তিতিরের ডাক ডাকে, বনমধ্য হইতে তিতির সাড়া দিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সেতার শোনায়, গান গায়, পাখীর মাংস রাঁধিয়া দেয়। রান্নাতেও হারাণের হাত বড় মিঠা। যায় না সে শুধু বাঘ শিকারের সময়। জোড়হাত করিয়া বলে—আজ্ঞে, আমার কত্তাবাবাকে বাঘে ধরে খেয়েছে। জ্যান্ত বাঘ দেখা আমাদের বংশে নিষেধ আছে।

মনোহরবাবুর জীবনে সে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। নারাণ রায় ভিন্ন একদণ্ড তাঁহার চলে না। হারাণের জীবনও বড় সুখেই কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সে কেমন হইয়া উঠে। বারবার ঠাকুরবাড়ীতে যায়, চারিদিকে চায়, পাথরের মন্দিরের প্রতি পাথরটি যেন মনে আঁকিয়া লয়। দ্বারের সশস্ত্র প্রহরীটাকে দেখিয়া অকারণে শিহরিয়া উঠে।

সেবার শিকারের পর্ব্বটা প্রবলভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল। খাঁটি আমিরী চালে সমস্ত চলিতেছে। বন্ধু, বাইজী, সঙ্গীত, সুরা, হাতিয়ার, হাতী, কিছুরই অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে নাচ-গানের আসর বসে। বাইজী নাচে, রায়জী সঙ্গত করে। রজনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রায়জী সঙ্গত ছাড়িয়া বাইজীর পদধূলি মাখিয়া গড়াগড়ি দেয়।

সেদিন মনোহরবাবু তারিফ করিয়া কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

রায়জী কাঁদিয়া আকুল হইল—হুজুর আমার পরিবার বড় ভাল নাচত। আহা-হা—সে মরে গেল! দেখবেন সে নাচ হুজুর?

সাঁওতাল নাচ নাচিতে শুরু করিল সে।

সুরার অবসাদে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উত্তেজনা কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাইজীর দল চলিয়া গেল। ঘুমে সব অচেতন। হারাণ উঠিয়া তাঁবুর দরজার পর্দ্দাটা টানিয়া দিল। তারপর মনোহরবাবুর পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরবাবুর নাক ডাকিতেছিল। ব্যজনের আরামে সে ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিল। পাখাখানি রাখিয়া হারাণ তাঁহার বুকে

হাত দিল। মোটা সোনার চেনটা সে খুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে মনোহরবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হারাণের বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল।

মনোহরবাবু উঠিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—এগুলো রাখ ত রায়জী! এই ঘড়ি, চেন—বোতাম—বুকে লাগছে আমার।

হারাণের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—নাও না হে খুলে!

হারাণ তাঁবুর দুয়ারের দিকে তাকাইল। জাগ্রত প্রহরীর পদশব্দের বিরাম নাই। জিনিসগুলি হাতের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া সে নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিল। প্রভাতে মনোহরবাবু উঠিতেই সে দুই হাতে জিনিসগুলি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ওগুলো তোমার বকশিস রায়জী। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে বলতে ভুলে গিয়েছি।

হারাণ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—গুণী লোক তুমি রায়জী, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু সিংহ বংশের আর সেদিন ত নেই।

হারাণ ধীরে ধীরে কহিল—আমাকে কি বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন বাবু?

হাসিয়া মনোহরবাবু বলিলেন—বামুনজাত কি না, দক্ষিণে পেলেই ভাবে বিদেয় ক'রে দিল বুঝি। যাও—বলে দাও দেখি, খেয়ে দেয়েই তাঁবু ভাঙতে হবে। আজই উঠতে হবে।

গজভুক্তকপিত্থের মত সিংহবাড়ীর অন্তঃসার বহুদিন হইতেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সেদিন একটা বড় মহালের নায়েব সংবাদ লইয়া আসিল—বৎসর বৎসর নিয়মিতরূপে রাজস্ব না পাইয়া জমিদার বড় রুষ্ট হইয়াছেন—অষ্টম নালিশ

দায়ের করিয়াছেন। মহালের টাকা ইতিপূর্ব্বেই আদায় হইয়া সদরে আসিয়াছে। সুতরাং এখন সদর হইতে টাকা দিয়া মহাল রক্ষা করিতে হইবে।

মনোহরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদানন্দময় মুখে তাঁহার চিন্তার ঘন বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

সদর-নায়েবকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—ওপারের কেঁয়ে-বেটার কাছে একবার দেখে আসুন তা' হ'লে। দশহাজার টাকা হ'লেই ত হবে।

নায়েব নতমুখে বসিয়া রহিল।

বাবু বলিলেন—কালই যান তাহ'লে। কি বলেন?

ধীরে ধীরে নায়েব কহিল—লোকটা বড় পাজী। যা তা বলে। ওর কাছে টাকাও নেওয়া হ'ল অনেক।

মনোহরবাবু শুধু কহিলেন—হুঁ।

তারপর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন—থাক তা হ'লে।

নায়েব প্রশ্ন করিল—কিন্তু অষ্টমের কি হবে?

—যাবে। কি করব—উপায় কি?

—অন্য কোথাও দেখব চেষ্টা ক'রে?

—দেখুন। কিন্তু—। সজাগ হইয়া তিনি নল টানিতে আরম্ভ করিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মজলিস বসিল। মনোহরবাবু হুকুম করিলেন—আজ করুণ রসের গান তুমি শোনাও রায়জী। মন যাতে উদাস হয়, চোখে জল আসে।

সুরা সেদিন তিনি স্পর্শ করিলেন না।

রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিল। পারিষদের দল চলিয়া গেল। বাবু বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য উঠিলেন। হারাণ জোড়হাত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মনোহরবাবু হাসিয়া বলিলেন—রায়জী?

—একটা নিবেদন আছে হুজুর।

—কি বল।

—একটু নির্জ্জন—

মনোহরবাবু আলোক-ধারী খানসামাটাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হারাণ কহিল—হুজুর, অভয় দিতে হবে আগে।

—কি ভয় তোমার ? বল তুমি বল।

—গরীব ভিক্ষুক আমি হুজুর, আপনার অন্নে বেঁচে আছি আমি। হুজুর—আমার—আমার······

মনোহরবাবু বলিলেন—বল, ভয় কি ?

হারাণের জিভটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, সে কহিল—আমার কিছু টাকা আছে হুজুর—হাজার দশেক হবে বোধ হয়। হুজুরের দরকারে লাগে—

মনোহরবাবু স্থির দৃষ্টিতে হারাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারাণ বলিল—পরে আবার আমাকে দেবেন হুজুর।

মনোহরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন—রায়।

তারপর আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। আলোকের কথা তাঁহার আজ খেয়ালই হইল না।

হারাণের চোখ দিয়া জল আসিল। বাবুর নীরব ধন্যবাদের ভাষা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। চাকরটাকে আলো লইয়া বাবুর সঙ্গে যাইতে বলিয়া দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে সে ধরিল একখানি বেহাগ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে হারাণ উঠিয়া চলিল পতিত আবর্জ্জনাভরা একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া। নির্দ্দিষ্ট একটা স্থান খুঁড়িয়া বাহির করিল ধাতুময় পাত্র একটা। তাহার মুখাবরণ খুলিয়া হারাণ বাহির করিল—সোনার বাট একখানি। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সেখানা রাখিয়া তুলিল আর এক-

খানি। সেও তেমনি উজ্জল। ও-গুলি ছাড়া আরও দুইটি বস্তু ঝক্ ঝক্ করিতেছিল—সে তাহার নিজের চোখ।

সকালে উঠিয়া কিন্তু হারাণকে আর পাওয়া গেল না। তাহার তানপুরাটাও নাই।

মনোহরবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—সে চলে গিয়েছে। আর আসবে না।

হারাণ এবার আসিয়া উঠিল কাশী।

ভাগ্যগুণে অবিলম্বে আশ্রয়ও একটু জুটিয়া গেল। পথেই সে গিরি-মাটিতে কাপড় ছোপাইয়া লইয়াছিল। গেরুয়ার উপর তানপুরা দেখিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিল। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া ডাকিয়া তাহাকে একটা মঠে আশ্রয়ও দিল।

চারিদিকে ধর্ম্মের সমারোহ। সেই সমারোহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হারাণ যেন ডুবিয়া গেল। সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মন যেন তাহার পবিত্র হইয়া গেছে। দিবারাত্রি শিব নামের কলরোলের মধ্যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যায় যোগীরাজের স্তব করে সে ধ্রুপদ-ধামারের মধ্য দিয়া। তাহার আচারে, ব্যবহারে একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল যেন। ইতর রসিকতা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন লজ্জা করে। সংযত মৃদুভাবে সে কথা কয়।

এদিকে অল্প দিনের মধ্যে গানের জন্য তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা মঠ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল। সাধু-সন্ন্যাসীরা গানে মুগ্ধ হইয়া সাদরে কোল দিয়া বলেন—বিশ্বনাথকো কৃপা আপ্‌কো পর হো গিয়া।

হারাণের চক্ষে জল আসে। সে জোর করিয়া তাঁহাদের পায়ের ধূলি লইয়া বলে—আশিস্ করিয়ে মহারাজ!

কিন্তু দুটি মানুষের মুখ অহরহ তাহাকে পীড়া দেয়। তমোরীশের অসহায়

কচি মুখখানি মনে পড়ে,—যখনই অনুদিত প্রাতে উষার-আলোয় সে সেতার লইয়া বসে তখনই মনে হয় তমোরীশ কুরঙ্গ শিশুর মত নীরবে মুগ্ধ চক্ষু দু'টি মেলিয়া গান শুনিতেছে। আর মনে পড়ে মনোহরবাবুর সেই সদানন্দময় মুখ। তাঁহার সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠের দুটি কথা 'রায়', তাঁহার সেই ছল ছল চোখ—সব মনে পড়ে।

তবু সে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে তাহার অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

মঠের ফটকে বসিয়া ভিক্ষা করে এক অন্ধ। পদশব্দ শুনিলেই সে চীৎকার করে—অন্ধকে দয়া কর বাবা। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা! হারাণের পদশব্দেও সে ভিক্ষা চায়। হারাণ হাসিয়া বলে—আমি রে,বাবা।

ভক্তিভরে অন্ধ কহে—সাধুবাবা, প্রণাম বাবা!

হারাণ আশীর্ব্বাদ করে।

এক এক দিন আক্ষেপ করিয়া অন্ধ বলে—আজ আর কেউ কিছু দিলে না বাবা!

—কিছু পাওনি? একটু চিন্তা করিয়া হারাণ সেইখানে দাঁড়াইয়াই গান ধরিয়া দেয়। চারি পাশে মুগ্ধ পথিকের দল ভিড় জমাইয়া দাঁড়ায়। গান শেষ করিয়া হারাণ সকলকে অনুরোধ করে—এই অন্ধকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে যান দয়া করে।

পয়সা পড়িতে থাকে। ভিড় ভাঙিয়া গেলে হাত বুলাইয়া পয়সাগুলি তুলিতে তুলিতে অন্ধ কৃতজ্ঞতাভরে বলে—বাবা—সাধুবাবা!

হারাণ অন্যমনস্কভাবে অন্ধের দিকে চাহিয়া থাকে; তার পর অকস্মাৎ দ্রুতপদে সে চলিয়া যায়।

অন্ধটা রাত্রে মঠের মধ্যেই এক পাশে পড়িয়া থাকে। ছেঁড়া একটা কম্বল ও চামড়ার একটি বালিশ তাহার সম্বল।

সেদিন অন্ধটা বলিল—সাধুবাবা।

—কি রে?

—আমার একটি কাজ ক'রে দেবে বাবা ?

—কি ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধ বলিল—কাল বলব।

পর দিন চলিয়া গেল। অন্ধও কিছু বলিল না, হারাণেরও সে কথা মনে ছিল না। তাহার পরদিন অন্ধ আবার কহিল—আমার কথা শুনলে না সাধুবাবা ?

হারাণ হাসিয়া বলিল—কই, তুমিও ত কিছু বল্লে না।

অন্ধ বলিল—আজ বলব।

—বল।

অন্ধ প্রশ্ন করিল—কে রয়েছে বাবা এখানে ?

চারিদিক দেখিয়া হারাণ কহিল—কই—কেউ ত' নাই।

অতি মৃদুস্বরে অন্ধ বলিল—আমায় কিছু সোনা কিনে দেবে বাবা ?

হারাণ চমকিয়া উঠিল।

চামড়ার বালিশটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্ধ কহিল—তামা, রূপো বড় ভারী হয় বাবা। আগে ক'বার এক সাধু আমায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ-কালে—

সে চুপ করিয়া গেল। হারাণের হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অন্ধ বলিল—তার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বাবা।

চামড়ার বালিশটা ওপাশে সরাইয়া কনুইয়ের চাপ দিয়া সে বসিল। কহিল—সাধুবাবা!

—হুঁ।

—এনে দেবে বাবা ?

হারাণ কহিল—দেব। কাল দেব।

পরদিন প্রাতে অন্ধটার কাতর ক্রন্দনে মঠের মধ্যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহার

সেই চামড়ার বালিশটা খোয়া গিয়াছে। সেই বালিশটির মধ্যেই তাহার জীবনের সঞ্চয় সঞ্চিত ছিল, কয়খান সোনার বাট, কিছু টাকা—কিছু পয়সা।

অন্ধ বার বার বলিতেছিল—সেই চোর সাধু—সেই বদমাস—

দীনতা ও হীনতার তাড়নায় গালাগালির অশ্লীলতায় স্থানটাকে কদর্য্য করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, পাথরের চত্বরে মাথা কুটিয়া নিজের অঙ্গ ও পবিত্র দেবভূমি রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

এর মাস চারেক পরে মনোহরবাবু একখানা পত্র পাইলেন।

বর্দ্ধমান হাসপাতাল হইতে রায়জী পত্র লিখিয়াছে—

মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ দুই মাস হইল অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া হাসপাতালে মরিতে আসিয়াছি। একবার দয়া করিয়া আসিবেন। ইতি—

আশ্রিত—নারায়ণচন্দ্র রায়

পরিশেষে হাসপাতালের চিকিৎসক জানাইয়াছেন—আসিলে সত্বর আসিবেন। এক সপ্তাহের অধিক রোগীর জীবনের আশা করা যায় না।

মনোহরবাবু রায়ের এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার পরদিনই বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। অপরাহ্নবেলায় তিনি হাসপাতালে হারাণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—রায়জী!

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হারাণ পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়াছিল। কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। বাবুকে দেখিয়া ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে তোমার অসুখ।

বহুক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া হারাণ কহিল—আর না; বাঁচবার কথা আর বলবেন না। আমার জীবন যাওয়াই ভাল।

মনোহর বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার হাত দুটি ধরিয়া মিনতিভরে হারাণ বলিল—আমাকে মাপ করুন বাবু!

অম্লান হাসি হাসিয়া বাবু কহিলেন—সে কথা আমি কোনদিন মনে করিনি রায়জী। তা ছাড়া তোমার আশীর্ব্বাদে সম্পত্তি আমার রক্ষা হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হারাণ বলিল—আরও অপরাধ আমার আছে। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি। আমি পাপী। আমার নাম নারাণ রায় নয়—

বাধা দিয়া মনোহরবাবু কহিলেন—জানি, তোমার নাম হারাণ আচার্য্য। সে থাক্।

কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল। বাবু কহিলেন—একটা কথা বলব রায়জী?

জিজ্ঞাস্থ নেত্রে হারাণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—পাপের ধনটা দিয়ে একটা ভাল কাজ তুমি ক'রে যাও যাবার সময়।

দুই হাতে বাবুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রভাবে হারাণ বলিল—উদ্ধার করুন বাবু, আমায় উদ্ধার করুন। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার,—প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।

বাবু কহিলেন—হাসপাতালেই টাকাগুলো তুমি দিয়ে যাও। এই হাসপাতালেই দিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হারাণ ধীরে ধীরে বলিল—বর্দ্ধমান ষ্টেশনের ধারেই একটা ছোট বাড়ী শেষে করেছিলাম। সেই ঘরের মেঝেতে—

সে নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার কহিল—এবার ক'টা বাঘ মারলেন?

আরও কয়টা কথা কহিয়া বাবু উঠিলেন—বলিলেন—কাল আবার আসব।

আরও একখানা পত্র গিয়াছিল তমোরীশের নামে। হৈম তমোরীশকে লইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পরই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম কাঁদিয়া কহিল—অসুখ হ'লে আমার কাছে গেলে না কেন?

তমোরীশকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দুটি জলের ধারা তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পর কহিল—তমোরীশ, আমার টাকা আছে তোকে বলে যাই।

হৈম বলিল—না দাদা, ব্যস্ত হয়ো না। ভাল হয়ে ওঠ আগে। হৈমর মুখের দিকে হারাণ চাহিয়া রহিল।

ঔষধ দিবার সময় হইয়াছিল। একজন নার্স আসিয়া ঔষধ দিতে গিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আবার সে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা দেখিয়া একটা ইন্‌জেকসন দিয়া ডাক্তার কহিলেন—তোমার যদি কোন কথা বলবার থাকে কাউকে—তবে বলে রাখাই ভাল।

হৈম কহিল—দাদা?

মুখের দিকে চাহিয়া হারাণ বলিল—নিশি কেমন আছে হৈম?

হৈম সে প্রশ্ন গ্রাহ্য করিল না, কহিল—তমোরীশকে কি বলবে বলেছিলে দাদা?

পাশ ফিরিয়া শুইয়া হারাণ কহিল—'কাল—কাল বলব। ঠিক বলব।'

সেই রাত্রেই হারাণ মারা গেল। হৈম, তমোরীশ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোটা ঘরখানা খুঁজিয়া, দেওয়াল ভাঙ্গিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহরবাবু একটি সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল—ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।

গয়লার ঘরে বিবাহে কন্যা পণ পায়। ছোট বৎসর ছয়েকের একটি মেয়ে, তাহার পণ একশত হইতে দেড়শত টাকায় উঠিয়াছে। এক পক্ষে গুপ্তিপাড়ার বাবুদের ৪৭৪নং তৌজির প্রজা গোপাল ঘোষ, অপর পক্ষের পাত্র হারাণপুরের মুখুজ্জেদের জমিদারীর প্রজা শিবু ঘোষ। শিবু আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল জমিদারের খুড়ো বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী।

কীটদষ্ট ফলের মত খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণ, কুব্জদেহ মুখুজ্জে তখন প্রচণ্ড ভগ্ন একটা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন,—ভাঙ ভাঙ, যত পারিস ভেঙে সাধ তোর মিটিয়ে নে।

তারপর ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের পিচ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, কচু কর্‌বি, তুই আমার কর্‌বি কচু। কাল চলে যাব পাকা বাড়ীতে। এতবড় পাকা বাড়ী পড়ে খাঁ খাঁ করছে। হীরু ত সাধাসাধি করছে, দানপত্র লেখাপড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। কাল রেজেষ্টারী ক'রে নেব।

হীরু অর্থাৎ হীরেন্দ্র, গ্রামের জমিদার। ব্যবসায়ে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়া আজ দুই পুরুষ তাহারা কলিকাতাবাসী! সম্প্রতি বালিগঞ্জে প্রাসাদের মত বাড়ী করিয়া সেইখানেই স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। তাহাদের পাকা বাড়ীটার কথা বিষ্ণু মুখুজ্জে বলিতেছিলেন। শিবু আসিয়া উপুড় হইয়া পা ধরিতে গেল। মুখুজ্জে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এ্যাই-ও—এ্যাই-ও! তফাৎ থেকে, তফাৎ থেকে যা বলছিস বল।

পা লইয়া মুখুজ্জের বড় ভয়। একটি পা তাঁহার খোঁড়া। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মুখুজ্জে পিছাইয়া গেলেন।

শিবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমায় বাঁচান, খুড়ো-হুজুর।

মুখুজ্জে একটা মোড়ার উপর বসিয়া গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—কি, হয়েছে কি তোর?

শিবু কাঁদিতে কাঁদিতেই আরম্ভ করিয়াছিল, একশো টাকায় কথা আমার সঙ্গে পাকা হয়েছিল—

মুখুজ্জে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠিলেন, চোপ রও ব্যাটা, খেঁকী কুকুরের বাচ্চা—কাঁদছিস্ কেন?—বলি, তুই কাঁদছিস্ কেন? মোছ বেটা চোখের জল, মোছ! যা বলবি ভাল ক'রে বল। তা না, এঁ্যাই-এঁ্যাই!

কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিয়া শিবু কথাটা কোনরূপে শেষ করিয়াই আবার কাঁদিয়া সারা হইল। মুখুজ্জে বলিলেন, এঁ্যাই—এঁ্যাই আবার কাঁদে, চোপ বেটা চোপ, এখন কি করতে হবে বল।

শিবু চুপ করিয়া রহিল। অন্তরের কথাটা প্রকাশ করিতে ভরসা হইতেছিল না। মুখুজ্জে উত্তেজনাভরে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরময় ঘুরিয়া-ফিরিয়া বলিলেন, এ হ'ল গোটা গাঁয়ের অপমান। ৪৭৪ নম্বর তৌজির সঙ্গে ২৭২ নম্বরের চিরকেলে ঝগড়া। পাঁচ হাত প্রস্থ একটা নালা—তার জন্যে দু-হাজার টাকা খরচ। তুই বেটা হারামজাদা জমিদারের স্বদ্ধ মুখ হাসালি। হীরু শুনলে বলবে কি আমায়? নিয়ে আয়, আজই রাত্রে ছিনিয়ে নিয়ে আয়।

শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল। মুখুজ্জে প্রবল রোষে খোঁড়া পা-টাই মাটির উপর ঠুকিয়া বলিলেন, ডাক তোদের সব গয়লাকে। ভেমো ব্যাটাদের মান-অপমান জ্ঞান নাই, ষাট বছর নইলে সাবালক হয় না—কলঙ্ক, তোরা কলঙ্ক।

শিব শুষ্ক মুখে বলিল, আজ্ঞে সে বড় বিপদের কাজ। থানা-পুলিস ফৌজদারী।

মুখুজ্জে মোড়াটার উপর বসিয়া খোঁড়া পা-খানি টিপিতে টিপিতে বলিলেন, এঃ, কানা-খোঁড়ার আশী দোষ—সে কথা মিথ্যে নয়। হুঁঃ, থানা পুলিস—সে একটা কথা বটে।

শিবু বলিল, আজ্ঞে তাই ত' বলছিলাম— শেষকালে জেল-টেল—

মুখুজ্জে আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তার আর আমি কি-করব? তুই খাটবি জেল, না, তুই িয়ে করবি আর আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘানি টানব? না—গাঁয়ের মুখ হেঁট হবে।

শিবু আবার মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে কিছু টাকা বাবুর ইষ্টাট থেকে—

মুখুজ্জে গম্ভীর হইয়া গেলেন! শিবু বলিল,—আজ্ঞে আপনি যদি ব'লে দেন—তা' হ'লে বাবু নিশ্চয় দেবেন।

মুখুজ্জে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা ত' দেবেন। কিন্তু কথা কি জানিস্, শিবু?

মুখুজ্জে অকারণে বারকয় নাক ঝাড়িয়া সহসা আকাশের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ঝিপির—ঝিপির—চব্বিশ ঘণ্টা, বিরাম নেই। বেটার যেন বাপ মরেছে, কান্না আর ফুরোয় না রে বাপু।···তাইত' শিবু, টাকা—কিন্তু শোধ করবি কিসে? জানিস ত'—এইটে বলে খাব-খাব, এইটে বলে কোথা পাব? এইটে বলে ধার করগে, এইটে বলে শুধবি কিসে—এইটে বলে খট-খট—লবডঙ্কা!

তিনি কনিষ্ঠা হইতে একে একে অঙ্গুলিগুলি নাড়িয়া সর্ব্বশেষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লবডঙ্কা দেখাইয়া দিলেন। মুখুজ্জেগিন্নী অন্তরাল হইতে বোধ করি সবই শুনিয়াছিলেন। পঞ্চাশের অধিক বয়স্কা প্রৌঢ়া এতখানি ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শিবুকে দেখিয়াও তাঁহার লজ্জা। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, বলি হ্যাগা—লোকটা কাঁদছে তোমার পায়ে ধরে, তবুও তোমার দয়া-মায়া নাই। তুমি ব'লে দিলে যদি হীরু টাকা দেয়,—তা তোমার একশ বার দেওয়া উচিত।

মুখুজ্জে বলিলেন, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। এই স্ত্রীবুদ্ধিতেই দেশটা মাটি হ'ল। বলি ও শোধ করবে কিসে শুনি?

মুখুজ্জেগিন্নী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, বলিলেন—কেন? শিবু জোয়ান বেটাছেলে, খেটে শোধ দেবে, রোজকার ক'রে শোধ দেবে।

মুখুজ্জে আবার প্রশ্ন করিলেন, খেটে শোধ করতে পারবে শিবু? তুমি বলছ?

—তা' পারবে না ? জোয়ান বেটাছেলে !

মুখুজ্জে বলিলেন,—তা'হ'লে না হয় তাই চল্‌রে শিবু কলকাতাই চল।

মুখুজ্জেগিন্নী বলিলেন, তুমি বলে দিলে হীরু দেবে ত' টাকা ?

মুখুজ্জে তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললে—কি বললে তুমি ?

গিন্নী এতটুকু হইয়া গেলেন, অপরাধীর মতই তিনি বলিলেন, না না তা' বলিনি আমি, হীরু ছেলেমানুষ। বড়ঠাকুর থাকলে—সে কি আর জানিনে আমি !

তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

মুখুজ্জে বলিলেন শিবুকে,—ত্থাখ শিবে, এ. দেড়শো টাকা দিয়ে কালসাপ ঘরে আনছিস তুই। বুঝে কাজ কর।

শিবু কিছুই বলিতে পারিল না, অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

মুখুজ্জে বলিলেন, এই মেয়েমানুষ জাতটাই পাজী। চব্বিশ ঘণ্টাই মতলব, কেমন ক'রে বিচ্ছেদ ঘটাবে। সব পর ক'রে তবে ছাড়বে ! শুনলি, শুনলি তুই মাগী কি বললে ? বলে হীরু তোমার কথা রাখবে ত ! আরে সে হ'ল আমার ভাইপো। মনে পড়ে, তোর দাদাবাবুকে ? ব্যাটা হাঁদ্‌লা, চেয়ে আছে দেখ। ওরে হারামজাদা হীরুর বাপকে, কত্তাবাবুকে মনে পড়ে ? বেষ্টা ছাড়া তার কোন কাজ হত না। বাঁশবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত্রে অন্ধকারে গর্ত্তেতে পা ভেঙে গেল। চুঁচড়োর হাসপাতালে দাঁত মেলে পড়ে রইলাম। দেওয়ালের ওপর পা তুলে দিয়ে গান করি, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?' আর চেঁচাই। কলকাতা থেকে মোটর ক'রে দাদা গিয়ে হাজির। প্রথমেই দিলেন কানটা মলে। বললেন, গাধা যাত্রা শুনতে যাও তুমি বাঁশবেড়ে ? গ্রামে দেখে খেদ মেটে না তোমার ? তারপর রোজ রোজ মোটর ক'রে আসা চাই। ফলফুলুরী ঝুড়ি ক'রে দিয়ে যেতেন। দিয়ে দিতাম ডাক্তারদের, নে বেটারা খেয়ে নে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, সেই হ'ল কিন্তু আমার সব্বনাশ। ডাক্তার বেটারা বলে কি—এ ত' কেউকেটা নয়। চাইলে, ঘুষ দাও, বড়লোক তোমরা, তোমরা না দিলে আমরা পাই কোথা! রেগে হতভাগীর বেটারা শেষে পা-টাই খাটো ক'রে দিল!

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া মুখুজ্জে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দাদা যদি থাকতেন আর আমি যদি মরতাম শিবে! তিনি থাকলে আজ আমি ভাবতাম না···তা হোক, নে, বাঘ নেই বাঘের বাচ্ছা আছে। হীরুও ভারি ভাল ছেলে। যা তুই গোটা-পাঁচেক টাকা যোগাড় ক'রে ফেল। এই গাড়ীতেই যাব চল।

চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া মুখুজ্জে বাহির হইবেন এমন সময় গিন্নী বলিলেন,—হ্যাঁ গা তুমি ত চললে, চালে কিছু খড় চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা—

মুখুজ্জে বাধা দিয়া বলিলেন, যাক ভেঙে পড়ে। পাকা বাড়ীর চাবি নিয়ে আসব। জিনিসপত্তর তুমি বরং বেঁধেছেঁদে রাখ।

হাওড়া স্টেশনে নামিয়াই মুখুজ্জে শিবুকে সাবধান করিয়া দিলেন, সাবধান বেটা গয়লা—এ আবার সিমেণ্টের ওপর বার্নিশ করা আছে। পা একবার হড়কালে আর রক্ষে নেই, একেবারে আলুর দম—এ্যাই—এ্যাই, বেটা ভেমো হাঁ ক'রে দেখছে দেখ। ওরে বেটা ওসব কেরোসিনের ডিপে নয়—ইলেক্‌ট্রিক আলো। চল বেটা চল। এ্যাই শিবে ধর না আমাকে একটু, খোঁড়া পা আমার, ধর ধর।

বড়বাজারের মোড়ে আসিয়া বলিলেন, শিবে, শুধু হাতে বাড়ীতে যাওয়া ভাল হবে? গেলেই ত' হীরুর ছেলেমেয়েরা ছুটে আসবে, দাদাবাবু এসেছে—দাদাবাবু এসেছে। কি বলিস তুই?

শিবু এতক্ষণ একটি কথাও কয় নাই, সে অবাক হইয়া দেখিতেছিল মহানগরীর বিপুলতা আর তার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার। ঈর্ষা সে করে নাই, একান্ত ক্ষুদ্র জীবনের

অতি স্বল্প কামনা সভয়ে যেন অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সে শুধু ভাবিতেছিল—এত, এত আছে সংসারে! মুখুজ্জের কথায় শিবু সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল কিছু মিষ্টি না হয় কিনে ন্যান-না খুড়ো হুজুর।

মুখুজ্জের কোঁচার খুঁটটি সুকৌশলে ট্যাঁকে গোঁজা ছিল। ট্যাঁকমুক্ত করিয়া মুখুজ্জে চাদরের খুঁটটি খুলিলেন! খুঁটে বাঁধা ছিল দুটি আধুলি। বারকয় নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি আধুলি মুখুজ্জে বাহির করিলেন। তারপর বলিলেন, চার আনার মিষ্টি নিয়ে নি, কি বলিস শিবু?

শিবু সসঙ্কোচে বলিল, আনা আষ্টেকেরই নিয়ে ন্যান খুড়ো হুজুর। একটি সিকি সে বাহির করিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, সে ভারি ভাল হবে, শিবু।

মিষ্টি কিনিয়া একটি ভাঁড়ে শালপাতা দিয়া মুড়িয়া লইয়া মুখুজ্জে বলিলেন, যাবার সময় চল হেঁটেই যাই। বেশ সব দেখতে দেখতে যাবি। কি বল্? আসবার সময় ত হীরুর মোটরে আসতে হবে, সে ত' ছাড়বে না। কানের পাশ দিয়ে সব দেখতে-না-দেখতে তীরের মত বেরিয়ে যাবে। এই ত' এইটুকু—কি বল্ শিবু?

শিবুর আপত্তির কারণ ছিল না। সে অগ্রসর হইল। ছোট একটা রাস্তার মোড়ে মুখুজ্জে শিবুর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এ্যাই—এ্যাই, বেটা চলেছে যেন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। চাপা পড়ে মরবি যে!

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। হীরেন বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোলাহল প্রায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। চাকরেরা শুধু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিতেছিল। মুখুজ্জে শিবুকে লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হাজির হইলেন। আউট-হাউসের বারান্দায় একখানা খাটিয়া পড়িয়াছিল, সেটার উপর ধপ করিয়া বসিয়া

পড়িয়া বলিলেন, বাপ্ রে বাপ, বালিগঞ্জ দেখি কিষ্কিন্ধ্যে পেরিয়ে। হীরু আর বাড়ী করবার জায়গা পায় নি রে বাবা!

বাহিরের কলতলায় বলাই চাকর খানকয়েক বাসন লইয়া বসিয়াছিল। গোবিন্দ ওপাশে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, কেহ কোন উত্তর দিল না। ভিতর হইতে ঠাকুর হাঁকিল, বলাই, থালা দিয়ে যাও।

বলাই সে কথারও কোন উত্তর দিল না। শুধু মৃদুস্বরে আপনাকেই বোধ করি বলিল, মর্ বেটা তুই গলা ফাটিয়ে।

মুখুজ্জে বলিলেন গোবিন্দ চাকরকে, বলি ও হে ছোকরা—কি নাম তোমার, আহা—মনে করি দাঁড়াও।

মনে কিন্তু পড়িল না। বাড়ীর ভিতর হইতে ঠাকুর এবার বাহির হইয়া আসিল, বলি ক'খানা থালা মাজতে কতক্ষণ যায় রে বলাই?—

বলাই সমান তেজে উত্তর দিল, দাঁড়াও, এ আমার হাত বটে, কল নয়।

ঠাকুর কিন্তু এ কথার কোন জবাব দিল না, সে বলিয়া উঠিল—খুড়োঠাকুর যে! কখন এলেন?

মুখুজ্জে অভিমানাহত স্বরে বলিলেন, দেখ, চিনতে পারছ ত? এরা ত' চিনতেই পারলে না। এই এয়ার ছোকরা ত ফস্ ফস্ ক'রে বিড়িই টেনে দিলে সামনে। ডাকলাম, বলি কি নাম হে তোমার? তা' কাকে কি বলছ! বাবু বসে বিড়িই টানছেন—বিড়িই টানছেন।

ঠাকুর অনেক দিনের লোক, সে বিগত কর্তার আমল দেখিয়াছে। মান-সম্মানের দিকে নজর আছে। সে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ রে গোবিন্দ—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ গোবিন্দে, বেটা গোবিন্দে। ভারি ঠেঁটা হয়েছে বেটা। দে বেটা, তামাক দে দেখি। তারপর ঠাকুর, এ-বাড়ীর খবর সব ভাল? হীরু ভাল আছে? বৌমা? তিনি কেমন

আছেন? নাতী-নাতনীরা কেমন আছে সব? বৌদিদি কেমন আছেন? তারপর তুমি কেমন আছ বল দেখি?

ঠাকুর এইবার অবসর পাইয়া বোধ হয় উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখুজ্জে আবার বলিয়া উঠিলেন, বলি হ্যাঁ হে, হীরুর সেই বড় কুকুরটা কি হ'ল হে? সেটাকে দেখছিনে ত! আর সেই সাদা খরগোশ দুটো, সে দুটো আছে ত?

বলাই বাসনের গোছাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, থালা নাও ঠাকুর।

ঠাকুর মুখুজ্জের কথার উত্তর না দিয়া বলিল, হাত মুখ ধুয়ে নেন খুড়োঠাকুর, আমি ভাত বেড়ে ফেলি।

বলিয়া সে ফিরিল। মিষ্টির ভাঁড়টি তুলিয়া মুখুজ্জে ব্যস্তভাবে ডাকিল, আরে শোন শোন—বলি অ—হরিহর! আঃ তোমরা যে দেখি সবাই ঘোড়ায় চড়ে কাজ কর।

ঠাকুরের নাম হরিহর। সে ফিরিল, ব্যস্তভাবে বলিল, কিছু বলছেন?

—বলছিলাম—। মুখুজ্জে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, বলি বৌদিদি জেগে নেই ত? তিনি থাকলে—

—না না তিনি উপরে গিয়েছেন। ব্যস্তভাবে ঠাকুর চলিয়া গেল।

মুখুজ্জে বলিলেন শিবুকে—তা হ'লে কি আর রক্ষে থাকত শিবু। ডাক এখুনি ডাক বিষ্ণু-ঠাকুরপোকে। তারপর এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, সে কেমন আছে; বললাম যে, দেশের পশুপক্ষীর খবরটা পর্য্যন্ত নেওয়া চাই। আর এটা খাও—ওটা খাও—বুঝলি কি না। সেবার আমার পেটের অসুখই ক'রে গেল। আর নাতী-নাত্‌নীরা জেগে থাকলে ঠকাঠক্ পেন্নাম, খোঁড়া পা নিয়ে সে আমার এক বিপদ!

শিবু একান্ত সঙ্কোচভরে বলিল, বাবুর সঙ্গে একবার দেখাটা করলে হত না!

মুখুজ্জে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, মারব বেটাকে খোঁড়া পায়েই এক লাথি! হারামজাদা বেটা—এ কি তোর ওই গুপ্তিপাড়ার বাবুরা নাকি? সমস্ত

দিন আপিসে কাজ ক'রে বেচারা একটু শুয়েছে। দেখছিস না বেটা ঘরে ঘরে নীলবর্ণ আলো জ্বলছে! দেখেছিস কখনও এমন আলো, শূয়ারকি বাচ্চা?

ঠাকুর ভিতর হইতেই ডাকিল, আসুন খুড়োঠাকুর, জায়গা হয়েছে।

মুখুজ্জে উঠিলেন, বলিলেন, গোবিন্দে, তামাক কি হ'ল র‍্যা—

গোবিন্দ সেখানে ছিল না। মুখুজ্জে ধমক দিলেন শিবুকে, নে রে বেটা হাত মুখ ধুয়ে নে। ব্যাটা বিয়ের জন্যে ভেবেই অস্থির।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড বাড়ীখানা সচল সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অদূরবর্ত্তী রাসবিহারী এভিনিউ-এর বুকে ট্রামের চাকার ঘর্ঘর শব্দে ও বিদ্যুৎপ্রবাহিত তারের একটা তীক্ষ্ণ গোঙানীতে পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মোটরের হর্নের বিচিত্র শব্দ মুহুর্মুহুঃ বাজিয়া চলিয়াছে। হীরেনবাবুর বাড়িতেও চাকরেরা ঘুরিতেছে যেন কলের পুতুল। সামনের খোলা জায়গাটার উপর দু'খানা প্রকাণ্ড মোটর সাফ করা হইতেছে। শচীন ড্রাইভার মোটরের নীচে শুইয়া একটা নাট্ আঁটিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে কলতলায় একটা ঝি বাসনের ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়াই অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে।

শিবু অবাক হইয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল। মুখুজ্জে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ওদিকের ঘরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন একজন মাস্টার ছোট ছেলেদের পড়াইতেছে। মুখুজ্জে ফিরিলেন। বারকয়েক এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আর একটা ঘরে ঢুকিলেন। জন দুই ফিট্‌ফাট্ বাবু মোটা মোটা খাতা লইয়া হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই আপনার?

মুখুজ্জের চাহিবার কিছু ছিল না। বলিয়া উঠিলেন, হীরু উঠেছে?

ভদ্রলোক এমন ভ্রূকুটি করিয়া উঠিলেন যে, মুখুজ্জের আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস হইল না। সম্মুখ দিয়া বাবুর খাশ-খানসামা কানাই কি একটা কাজে চলিয়াছিল, মুখুজ্জে ডাকিলেন, বাবা কানাই।

কানাই মুখ ফিরাইল। মুখুজ্জে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু কোথায় বাবা?

—ড্রইংরুমে বসে আছেন।

কানাই চলিয়া গেল। মুখুজ্জে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মূল-বাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইলেন। মার্ব্বেলে মোড়া বারান্দা। অতি সন্তর্পণে বারান্দাটা অতিক্রম করিয়া একেবারে পূর্ব্বদিকের ঘরে উঁকি মারিয়া মুখুজ্জে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘরটা ড্রইংরুম। একটা সোফায় বসিয়া হীরেনবাবু গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

মুখুজ্জে একবার নাক ঝাড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন শব্দ তাহাতে উঠিল না। মিনিট দুই-তিন পর মুখুজ্জে যেমন সন্তর্পিত পদক্ষেপে গিয়াছিলেন—তেমনি ভাবেই ফিরিয়া আসিয়া খাটিয়ার উপর বসিলেন।

শিবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুর সঙ্গে—

বাধা দিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, মার্‌বেল দেখেছিস্ শিবু? মার্‌বেল? মানে মর্ম্মর পাথর? যা দেখে আয়, বারান্দাটা একবার দেখে আয়।

শিবু অবাক হইয়া খুড়োঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুখুজ্জে কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি আবার উঠিয়া পড়িলেন। এবার উঁকি মারিলেন আউট-হাউসেরই আর একটা ঘরে। ঘরের মধ্যে একখানা চৌকীর উপর একটি যুবা বসিয়া অনর্গল কি লিখিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া মুখুজ্জের সাহস হইল। লোকটির পারিপার্শ্বিক ও একাগ্র উদাসীনতার মধ্যে তিনি যেন অভয় পাইয়াছিলেন। চারিপাশে কতকগুলা পোড়া বিড়ি সিগারেট, রাত্রের বিশৃঙ্খল বিছানা তখনো তোলা হয় নাই, এক কোণে মশারিটা জড়ো হইয়া আছে। লোকটি মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া তাকায়, সে দৃষ্টি শূন্য কিন্তু কোমল। মুখুজ্জে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুমি আবার কে হে? নতুন মাস্টের বুঝি?

লোকটি বলিল, না। আমি এঁদের আত্মীয়।

ভ্রূকুটি করিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, আত্মীয়? আমার অজানা? কি নাম তোমার? ভদ্রলোক তখন আবার লেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

পায়ের চেটোর উপর চাপড় মারিতে মারিতে অগত্যা মুখুজ্জে ডাকিলেন, গোবিন্দে, অ—গোবিন্দে!

কেহ সাড়া দেয় না। মুখুজ্জেও চুপ করিয়া গেলেন। অকস্মাৎ বার দুই নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, এগুলো ফাঁকা ছিল কত! এই হীরুর মেয়ের বে'র সময়। হীরু আমার ভাইপো হয়, বুঝলেন!

ভদ্রলোক লিখিতেছিল, কোন সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুখুজ্জে আপন মনেই বলিলেন, তের শো উনচল্লিশ সাল মাঘ মাস। এই ত' মোটে দু-বছর!

তারপর আবার বলিলেন, হীরুর মেয়ে এই ত সেদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদত। এরই মধ্যে ছেলে হয়ে গেল। জানেন—হীরুর সঙ্গে আমার খুব নিকট সম্বন্ধ।

শেষের কথাগুলিও ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল, কিন্তু সে ইহাতেও কোন উত্তর দিল না। মুখুজ্জে এবার জানালার দিকে তাকাইয়া ডাকিলেন, শিবে —অ—শিবে! ঘুমুচ্ছিস না কি রে? ওরে বেটা, দিনে ঘুমুস নে এখানে, নোনা ধরবে, মরবি।

শিবের নিকট হইতেও কোন সাড়া আসিল না। মুখুজ্জে যেন হাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, নাঃ, এ তো ভাল নয়। কেউ গেরাহ্যিই করে না দেখি।

বাড়ীর পুরানো ঝি চিত্ত একরাশ কাপড়-জামা ঘরখানার পাশের কলতলাতে ফেলিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিল, মুহুরী বাবু যে! কখন এলেন?

একগাল হাসিয়া মুখুজ্জে বলিলেন—ভাল আছ চিত্ত?

চিত্ত বলিল, আমাদের আবার ভাল-মন্দ! গতরে না খাটলে ত' খেতে দেবে না মশায়! দু-দিন অসুখ হ'লে কেউ বলবে না যে, চিত্ত আজ শুয়ে থাক তুই!

মুখুজ্জে বলিলেন, বাড়ীর সব, বৌদিদি, ছেলেরা—এরা সব ভাল ত?

চিত্ত বলিল, মন্দ কি দুঃখে থাকবে বলুন ? মাথা ধরলে দশটা ডাক্তার আসে, মাথার শেয়রে ডাক্তারখানা বসে। রোগে ভোগে গরীব, বুঝলেন !

সে কাপড়গুলা লইয়া কলতলায় বসিল। মুখুজ্জে এবার বাহির হইয়া আসিয়া চিত্তকে প্রশ্ন করিলেন—এ ছোকরা কে চিত্ত ?

চিত্ত বলিল, উনি যে পিসেমশায়—বাবুর মাসতুত বোনের বর।

—অ—। তা, ও ছোকরা এত নেকে কি চিত্ত, দিনরাত ?

কলটা কাপড়ের রাশের উপর খুলিয়া দিতে দিতে চিত্ত বলিল, উনি বই লেখেন সব। ছাপা হয়, নাম হয়।

মুখুজ্জে ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাসানের গান নেকেন ? না পাঁচা

কানাই ঠিক এই সময়েই আসিয়া বলিল, আপনাকে বাবু ডাকছেন।

মুখুজ্জে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমাকে ?

—হ্যাঁ, আবার কাকে ? কানাই চলিয়া গেল।

মুখুজ্জে যাইতে যাইতে চিত্তকে বলিলেন,—কানাই-ছোঁড়ার ভারি গরম হয়েছে চিত্ত।

এই কথার উত্তরেই নাকি কে জানে, চিত্ত বলিল—বাপ রে বাপ, এই রাশ রাশ কাপড় কাচা—এ বাবা চিত্ত হতভাগী ছাড়া কেউ করবে না। আর মার লাথি—মার ঝাঁটা চিত্তর ওপরেই।

ড্রইংরুমের একখানা সোফার মাথায় হাত দিয়া মুখুজ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হীরেনবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—কখন এলেন আপনি ?

মুখুজ্জে উত্তর দিলেন, ভাল আছ বাবা হীরু ?

হীরেনবাবু ছোট্ট একটা ব্যাগ খুলিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া মুখুজ্জের হাতে দিলেন। বলিলেন, পড়ুন। আরও কয়েকবার নায়েব আমায় লিখেছিলেন। কিন্তু আমার জানাবার অবসর হয় নি।

মুখুজ্জে দেখিলেন, চিঠিখানা নায়েবের লেখা। সে লিখিয়াছে, প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—রাজবাটীর কুশল সমাচার দানে ভৃত্যকে সুখী করিবেন।

হীরেনবাবু বলিলেন, বয়েস অনেক হ'ল আপনার। সামর্থ্য দিন দিন কমেই যায়। আপনার দোষ দিই না আমি।

মুখুজ্জে পড়িতেছিলেন,—আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় মুহরী বাবু শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা কাজকর্ম্মের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। এরূপ লোক লইয়া কার্য্যের দায়িত্ব লইতে এ অধীন একান্ত অক্ষম।

হীরেনবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, এস্টেট থেকে মাসে কিছু ক'রে ভাতার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। অনেক পুরানো লোক আপনি।

মুখুজ্জে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হীরেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাবু বলিলেন, তা' হলে গিয়েই আপনি কাগজ-পত্তর নায়েব বাবুকে বুঝিয়ে দেবেন। বুঝলেন?

ঘরের দরজা জানালা যেন কাঁপিতেছিল। পায়ের নীচের মাটি, সেও যেন কাঁপিতেছে। মুখুজ্জে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শিবে বারান্দায় শুইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, শিবে, আয় আয়, টেরেন ফেল হয়ে যাবে।

শিবু বলিল, বাবু কি বললেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, সে সব পথে বলব আয়।

ঘণ্টা দুই পরে ঠাকুর আসিয়া ডাকিল, খুড়ো-মশায় চান ক'রে নিন।

খুড়োর সাড়া পাওয়া গেল না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল বলাইকে, কানাইকে, গোবিন্দকে।

বলাই বলিল, কে জানে বাবা, আমার মরবার সময় নাই।

কানাই কোন উত্তরই দিল না।

গোবিন্দ বলিল, এইখানেই ত ছিল।

বলিয়া যে স্থানটা নির্দ্দেশ করিল সেখানে শুধু শালপাতায় মোড়া ছোট একটি ভাঁড় পড়িয়াছিল।

তখন ময়দানে মিউজিয়াম-এর সম্মুখে চলিতে চলিতে মুখুজ্জে শিবুকে বলিতে ছিলেন, একটু বস শিবু,—বসে সব তোকে বলব আয়। দে বাবা পা-টা একটু টেনে দে ত। আঃ আঃ। রাস্তা কি কম রে!

শিবু সতৃষ্ণনয়নে মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মুখুজ্জে বলিলেন, বয়স ত কম হ'ল না। তাই বললাম আজ হীরুকে। বাবা উপযুক্ত হয়েছ, সব দেখে শুনে নাও! আমি এইবার কাশী যাব। হীরুর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল!

মুখুজ্জে নীরব হইলেন। আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ দেখলাম আমি শিবু, হীরুর চোখ ছল ছল করছে। তারপর আমাকে কি বললে জানিস, বললে,—খুড়ো-মশায়, মাসে কিছু করে পেনামী কিন্তু আপনাকে নিতে হবে।

শিবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি হ'ল, বাবু কি বললেন?

মুখুজ্জে বলিলেন, বলতে পারলাম না রে শিবু। বুঝলাম, হীরুর এখন বড় টানাটানি চলছে, সেই দেখে বুঝলি বলতে পারলাম না।

শিবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মুখুজ্জে বলিলেন, অম্‌নি ব্যাটা ভেঁমোর মুখ শুকিয়ে গেল। আরে ৪৭৪ নম্বরের কাছে ২৭২ তৌজির অপমান বিষ্ণু মুখুজ্জে বেঁচে থাকতে হবে ভাবিস? গিন্নীর দু-গাছা তাগা আছে সেই দু-গাছা বেচে দেব। কি হবে? বুড়ীর আবার গয়নার সখ কেন? বুঝলি। খেটে শোধ দিবি তুই। আমি মরে গেলে কিছু কিছু ক'রে কিন্তু বুড়ীকে দিবি কেমন? এ্যাই এ্যাই, বেটা পা ধরে টানে দেখ, পা ধরে টানে দেখ। দেখেছিস শিবে, কি চক্‌চকে মোটরখানা দেখেছিস, আর কত বড়! হীরুর মোটরখানা কিন্তু এর চেয়েও দামী—একটু পুরানো হয়েছে, এই যা।

সমাপ্ত